যে গল্পের শেষ নেই : যে গল্পের শেষ নেই : যে গল্পের শেষ নেই :

যে গল্পের শেষ নেই : যে গল্পের শেষ নেই : যে গল্পের শেষ নেই : যে গল্পের শেষ নেই :

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

প্রথম খণ্ড

পরিবেশক

দি ক্যাল্‌ক্যাটা বুক ক্লাব লিঃ

৮৯, হ্যারিসান রোড, কলিকাতা ৭

৫নং চৌরঙ্গী টেরাস-এর শ্রীশক্তি প্রেস থেকে বীরেন সিমলাই কর্তৃক মুদ্রিত এবং ৩০ সাহিত্য পরিষদ ষ্ট্রীট, কলকাতা ৬, থেকে ধীরেন্দ্রনাথ রায় কর্তৃক প্রকাশিত।

২২শে জুন, ১৯১৭।

কভার এবং ১, ৪৯, ৫১ ও ৫৬ পৃষ্ঠার ছবি এঁকেছেন প্রভাশ সেন, বাকি খালেদ চৌধুরী

যে গল্পের শেষ নেই
প্রথম খণ্ড

দুপুর বেলা খেয়েদেয়ে একটুখানি গড়িয়ে নেবো ভাবছি, এমন সময় একটি ছোট্ট মেয়ে আমার ঘরে এলো। আর মেয়েটি সোজা-সুজি বললো, "ভালো চাও তো একটা গল্প বলো, খুড়ো ; নইলে দর্জিপাড়া থেকে কাঁচি এনে তোমার গোঁফজোড়া এক্কেবারে সাফ করে দেবো।"

মেয়েটি আমারই ভাইঝি। ওর আসল নাম রুণু, কিন্তু আমি ওকে আদর করে ডাকি চিঙকিপ্রসাদ বলে। নইলে আমার নামের সঙ্গে ওর নামের যে মিল থাকে না! আর এই নামটার জন্যে মেয়েটি আমাকে দারুণ ভালবাসে। কেননা, ওর মতে রুণু নামটা বড় খটোমটো, করাত দিয়ে কাঠ কাঠবার মতো। চিঙকি-প্রসাদ নামটি বেশ মোলায়েম, সাবানের ফেনার মতো।

আমাকে এতো ভালবাসে বলেই দুপুর বেলায় গল্প শোনবার জন্যে আমার ঘরে হাজির হয়। আর পাছে আমি গল্প বলতে রাজি না হই এই ভয়ে আমাকে নানান রকম ভয় দেখায়।

আমি অবশ্য জানি দর্জিপাড়ায় সত্যিই গোঁফ কাটবার কাঁচি পাওয়া যায় না। তবু ওকে খুশী করবার জন্যে ভয় পাবার ভান করলাম, বললাম "থাক থাক। তোমাকে আর অতোখানি কষ্ট করতে হবে না। গল্প বলতে আমি রাজি হলাম।"

"বেশ," মেয়েটি আমার খাটের ওপর জাঁকিয়ে বসলো আর বললো, "তাহলে শুরু করো তোমার গল্প।"

আমি বললাম, "শুরু তো যা-হোক একটা করে দেওয়া যায়। কিন্তু ভাবছি, শেষ করবো কেমন করে?"

মেয়েটি অম্লান বদনে বললো, "শেষ করা নিয়েই যদি অতো ভাবনা তাহলে শেষ না হয় নাই করলে!"

আমি বেশ ঘাবড়ে গেলাম। বললাম, "তার মানে?"

"কেন? তার মানে, এমন গল্প বলে যাও যে-গল্পের শেষ নেই।"

আমি বললাম, "এ তো ভারি ফ্যাসাদের কথা হোলো। কেননা, শেষ নেই এমন গল্প বেশীর ভাগই হল ফাঁকির গল্প। অথচ, তুমি লোকটি এমনই চালাক যে তোমাকে ফাঁকি দেওয়া তো চলে না।"

"উঁহু," রুণু বললো, "ফাঁকি দেওয়া চলবে না। এমন গল্প বলতে হবে যার মধ্যে একটুও ফাঁকি নেই।"

"তার মানে, সত্যি কথা হওয়া চাই—এই তো?"

"হুঁ, একেবারে খাঁটি সত্যি।"

এমনতরো ফরমাস পেলে সবাই খুব বিপদে পড়ে। আমিও খুব বিপদে পড়লাম। বললাম, "শেষও থাকবে না, ফাঁকিও থাকবে না,—এ-রকম গল্প যে একটাই আছে। কিন্তু সেটা শুনতে কি তোমার ভালো লাগবে ?"

"কেন ? কার গল্প সেটা ? লক্ষ্মীপেঁচার না হুতোম পেঁচার ?"

"সেই তো বিপদ। লক্ষ্মীপেঁচারও নয়, হুতোম পেঁচারও নয়। সেটা হল তোমার গল্প, আমার গল্প, আমাদের সবাইকার গল্প। তার মানে, মানুষের গল্প। আবার তার মানে গল্পই নয়, সত্যি কথা ; পণ্ডিতী ভাষায় যাকে বলে ইতিহাস।"

"উঁহু। ও সব পণ্ডিতী ভাষা বলা চলবে না।"

"তা না হয় নাই বলবো।"

"তাছাড়া, এ-গল্প তুমি জানলে কোথা থেকে ?"

"আমি জেনেছি, বই-টই পড়ে।"

"বইতে কি সব সত্যি কথা লেখা থাকে ?"

"সব বইতে নয়," আমি বললাম, "অনেক বইতে সত্যি কথা লেখা থাকে, আবার অনেক বইতে মিথ্যে কথা লেখা থাকে। যে-সব বইতে সত্যি কথা লেখা থাকে সেগুলোর পণ্ডিতী নাম হল বৈজ্ঞানিক বই।"

"আবার পণ্ডিতী !"

"না না, আর বলবো না।"

"তুমি কি সেই সব বই থেকেই গল্পটা বলবে ?"

"তাইতো ভাবছি।"

"বেশ। শুরু করো তোমার গল্প। কিন্তু মনে থাকে যেন—শেষও করতে পারবে না, ফাঁকি দিতেও পারবে না।"

"শুরু করছি! কিন্তু তার আগে একটা কড়ার করতে হবে। কথায় কথায় তুমি আমাকে এ-রকম জেরা করতে পারবে না। কেননা, তাহলে কথায় কথায় আমার গল্প মুখ থুবড়ে পড়বে, এগুতে পারবে না।"

"রাজি আছি," রণু বললো।

আর আমি শুরু করলাম আমার গল্প।

শূন্য নিয়ে ছেলেখেলা?
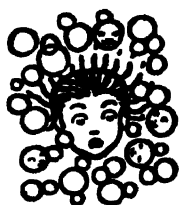
মানুষের গল্প বলতে বসার একটা মুস্কিল আছে। মুস্কিলটা হল, মানুষের গল্প বলতে গেলে মানুষের কথা দিয়ে শুরু করা যায় না। কেননা, এককালে পৃথিবীর কোথাও মানুষের টিকিটি খুঁজে পাবার যো ছিলো না। আবার তারও আগে কোথাও পৃথিবী বলে কোনো কিছুর চিহ্ন ছিলো না।

তাহলে? কোথা থেকে এলো এই পৃথিবী? মানুষের দলই বা এলো কোথা থেকে?

এই সব কথা থেকেই শুরু করতে হবে মানুষের গল্প। কিন্তু তাতেও খুব মুস্কিল আছে। কেননা, এই সব কথা এতো ভয়ানক ভয়ানক বেশীদিন আগেকার কথা যে তা শুনে

ব্যাপারটা ঠিকমতো ঠাহর করতে পারা যায় না। যেমন ধরো, হিসেব করে দেখা যাচ্ছে, পৃথিবীর জন্ম হয়েছে নিদেনপক্ষে দেড়শো কোটি বছর আগে তো বটেই, তার চেয়েও অনেক বেশী বছর হতে পারে!

ভেবে দেখো ব্যাপারটা! দেড়শো কোটি বছর! তার মানে, দেড়শোর পেছনে সাত সাতটা শূন্য! কিন্তু শূন্য নিয়ে তো সত্যিই ছেলেখেলা নয়। এক একটা শূন্যর চোটেই একেবারে আকাশ পাতাল তফাৎ হয়ে যায়। একের পিঠে একটা শূন্য বসাও, হয়ে যাবে দশ। অথচ, দশ বছর আগেকার কোনো ব্যাপারই তুমি নিজের চোখে দেখো নি, কিম্বা দেখলেও কিছুই তোমার মনে নেই। কেননা, হয় তুমি তখন জন্মাও নি, আর না হয়তো এতো ছোট্ট ছিলে যে তখনকার কোনো কথা তোমার মনে নেই।

আর একটা শূন্য বাড়াও। হয়ে যাবে একশো। একশো বছর, বাস্‌রে! তুমি তো তুমি, তখন তোমার দাদুই বলে জন্মান নি। হয়ত তোমার দাদুর বাবা সবে পাত্‌তাড়ি বগলে করে পাঠশালায় যেতে শিখছে। তখন এই কলকাতা বলে সহরটার চেহারাই কি এই রকম ছিলো নাকি? তখনো ঘোড়ায় টানা ট্রামগাড়িরই চল হয়নি, আজকালকার ট্রামগাড়ি আর মটরগাড়ির কথা তো কেউ ভাবতেই পারতো না। এই রকম: একটা শূন্যের চোটে একেবারে অন্য রকম। তারপর আর একটা শূন্য বাড়াও। একের পিঠে তিনটে শূন্য। একহাজার। এক হাজার বছর আগেকার কথা কিছু ভাবতে পারো? তখন, ইংরেজ তো দূরের কথা, আমাদের দেশে

মোগল আসে নি, পাঠান আসে নি। কলকাতা সহর তো দূরের কথা, এমন কি দিল্লীর দরবারের চিহ্নটুকুও নেই! আরো একটা শূন্য বাড়াও, হয়ে যাবে দশ হাজার বছর। বাস্‌রে, সে কি কম কথা? রামায়ণ-মহাভারতেরও আগেকার কথা। তখন শুধু বনজঙ্গল। সভ্য মানুষের চিহ্ন কোথাও নেই। এখানে ওখানে অসভ্য মানুষের দল ফলমূল আর শিকার জোগাড় করবার আশায় হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারপর যদি আরো একটা শূন্য বাড়াও তাহলে হয়ে যাবে একের পিঠে পাঁচটা শূন্য। তার মানে এক লক্ষ বছর। তখন যে কী রকম ব্যাপার তা আন্দাজ করতেই পারা যায় না।

তাই বলছিলাম, শূন্য নিয়ে ছেলেখেলা নয়। এক একটা করে শূন্য বাড়িয়ে যাওয়া মানেই একেবারে দারুণ রকমের পেছিয়ে পেছিয়ে যাওয়া। পাঁচটা শূন্যয় যখন পৌঁছলাম তখন এতোদূর পেছনের কথা ভাববার দরকার পড়লো যে মাথা প্রায় গোলমাল হয়ে যাবার যোগাড়। তাই দেড়শোর পেছনে সাত সাতটা শূন্যর কথা ফস্‌ করে বলে দেওয়াটা যতো সহজ আসলে ব্যাপারটা মোটেই তেমন সহজ নয়।

তার মানে, ভয়ানক আর ভয়ানক রকমের থুরথুরে বুড়ী এই পৃথিবী। এতো থুরথুরে আর এমন বুড়ী যে ভালো করে ভাবতেই পারা যায় না। কিন্তু এর দিকে চেয়ে দেখো, অবাক হয়ে যাবে। বুড়ী কোথায়? সবুজ ঘাস, সোনালী ধান, রঙিন ফুলে ঝলমল। বুড়ী কোথায়? এ তো বরং নিত্যনতুনের মেলা! যে-পাখী আগে কখনো ডাকে নি আজকের ভোরে সেই পাখীর ডাক, আগে যেখানে ছিলো

গভীর অরণ্য আজকের দিনে সেইখানে গড়ে উঠেছে বিরাট বিরাট সহর। চিম্‌নীর চূড়োগুলো কী দারুণ উঁচু, বাস্‌রে! মনে হয় আকাশটাকে বুঝি ফুটো করে দেবে। পাঁচশো বছর আগে এ-রকম উঁচু উঁচু চিমনীর কথা কেউ ভাবতে পারতো?

চারদিকেই এই রকম। নিত্যনতুন। তাহলে বুড়ী কোথায়?

অথচ বুড়ীই। কেননা, দেড়শো কোটি বছর বয়েসটা তো চারটিখানি কথা নয়। আর হিসেব করে দেখা যাচ্ছে পৃথিবীর বয়েস নিদেন পক্ষে অতোগুলো বছর তো হবেই!

বুড়ী পৃথিবীর বয়েস কতো?

কিন্তু কথা হল, পৃথিবীর বয়েস যে এতোখানি হয়েছে তা জানা গেলো কেমন করে? নিশ্চয়ই হিসেব করে। কিন্তু সে-হিসেবটা কেমনতরো? ওঃ, সে-সব ভারি মজার মজার হিসেব। একটা নমুনা দিচ্ছি। শোনো।

ধরো, তুমি আর আমি রাস্তায় বেড়াতে বেরিয়েছি। পথে এক বুড়ীর সঙ্গে দেখা। তার মাথায় অনেক সাদা চুল। আর বুড়ী হয়ত আমাদের বললো, তার চুল পাকবার গল্পটা ভারি মজার। তার নাকি জন্ম হবার পর থেকেই প্রতি বছর হাজারে একটা করে চুল পেকেছে। তারপর,

বুড়ী একগাল হেসে আমাদের জিগ্গেস করলো : বলো দিখিনি আমার বয়েস কতো হয়েছে ?

আমরা আর কী করি ? দুজনে মিলে গুণতে শুরু করলাম : বুড়ীর মাথায় সবশুদ্ধ কতোগুলো চুল আছে আর তার মধ্যে কতোগুলোয় পাক ধরেছে, কতোগুলোয় পাক ধরে নি। আমরা হয়ত গুণতি করে দেখলাম, বুড়ীর মাথায় সবশুদ্ধ এক লক্ষ চুল আর তার মধ্যে দশ হাজারটা হল সাদা চুল। এর পর বুড়ীর বয়েসটা হিসেব করে ফেলা কিছু কঠিন হবে না। এক বছরে এক হাজারটার মধ্যে একটা করে চুল সাদা হয়েছে; তার মানে এক লক্ষর মধ্যে একশো করে সাদা হয়েছে। সবশুদ্ধ দশহাজার সাদা চুল। তার মানে দশ হাজারকে আমরা একশো দিয়ে ভাগ করে দেবো, বেরিয়ে যাবে বুড়ির বয়েস। ভাগ করলে কতো হবে ? একশো বছর নিশ্চয়ই।

এই রকমই একটা হিসেব করে একদল লোক বুড়ী পৃথিবীর আসল বয়েস বের করে ফেলবার চেষ্টা করেছেন। পৃথিবীর অবশ্য মাথা নেই, মাথায় একমাথা সাদা চুলও নেই। কিন্তু পৃথিবীর বুকে আছে এক রকমের জিনিস, যার নাম ইউরেনিয়াম্। এই ইউরেনিয়াম্ বলে জিনিসটা ভারি মজার। এর থেকে একটানা যেন এক রকম তেজ বেরিয়ে যাচ্ছে আর ওই তেজ বেরিয়ে যাবার দরুণ ইউরেনিয়াম্ ক্রমাগতই বদলে যাচ্ছে, বদলাতে বদলাতে একরকম শিষে হয়ে যাচ্ছে। ধরো, মাটি খুঁড়ে একতাল ইউরেনিয়াম্ পাওয়া গেলো, তার ওজন এক সের। হিসেব করে দেখা

যায়, এই এক সের ইউরেনিয়ামের মধ্যে প্রতি বছর ১÷৭৪০০০০০০০০০ সের করে ইউরেনিয়াম্ বদলে গিয়ে এক রকম শিষে হয়ে যায়। এখন ব্যাপারটা হয় কি জানো? মাটি খুঁড়ে খানিকটা ইউরেনিয়াম্ তুললে দেখতে পাওয়া যায় ইতিমধ্যেই তার অনেকখানি শিষে হয়ে গিয়েছে। তাহলে ইউরেনিয়ামের ওই তালটার মোট ওজনের তুলনায় তার মধ্যেকার শিষের ওজন কতোখানি এ থেকে নিশ্চয়ই হিসেব করে বলে দেওয়া যায় ইউরেনিয়ামের ওই তালটার বয়েস কতো হ'লো। যেমন, যদি দেখি একসেরের মধ্যে ১÷৭৪০০০০০০০০০ সের শিষে তাহলে বলবো ইউরেনিয়াম্টার বয়েস হল এক বছর। যদি দেখি ১০০÷৭৪০০০০০০০০০ সের শিষে তাহলে বলতে হবে ওটার বয়েস একশো বছর। পণ্ডিতেরা বলছেন, পৃথিবী যখন সবে জন্মালো তখন তার বুকে যে-ইউরেনিয়াম্ সেটা ছিলো খাঁটি ইউরেনিয়াম্, তার মধ্যে কোনো শিষের ভেজাল ছিলো না। কিন্তু আজকের দিনে যেখান থেকেই ইউরেনিয়াম্ যোগাড় করা যাক না কেন, দেখা যায় তার মধ্যে খানিকটা করে শিষের ভেজাল। আর তাই, মোট ইউরেনিয়াম্টার তুলনায় শিষের যে-ভেজাল তা কতোখানি, এই দেখে হিসেব করে বলে দেওয়া যায় পৃথিবীর বয়েসটা কতো হল! আমাদের ওই বুড়ীর মাথার পাকা চুল গুণে তার বয়েসটা বের করবার মতোই হিসেব নয় কি? এই রকমের হিসেব করে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, বুড়ী পৃথিবীর বয়েসটা নেহাত কম নয়, নিদেন পক্ষে দেড়শো কোটি বছর তো হবেই।

সে এক তুমুল কাণ্ড
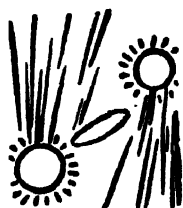
বেচারা পৃথিবী! এতোখানি বয়েস হল, কিন্তু জন্মদিনের ঘটাপটা বলে কিছুই হল না। কেমন করে হবে? যা মেজাজ তার মা-ঠাকরুণের, কাছ ঘেঁষবার আর আবদার করবার সাহস কারুর নেই। সে শুধু আকাশে অষ্টপ্রহর গনগন করছে, তার কাছাকাছি কেউ গিয়ে পড়লে পুড়িয়ে একেবারে ধোঁয়া করে দেবে। রক্ষে এই, যে আমরা থাকি তার চেয়ে অনেক দূরে—প্রায় ৯২৯০০০০০ মাইল দূরে। কাছেপিঠে থাকতে হলে আমাদের চুলের টিকিটিও আর খুঁজে পাওয়া যেতো না!

পৃথিবীর এই গনগনে গরম মা-ঠাকরুণটির নাম হল সূর্য। কিন্তু মেজাজ যতো গরমই হোক না কেন, পৃথিবীর দিকে তার দারুণ টান। আবার তার দিকেও পৃথিবীর টান কম নয়। কেবল কাছে যাবার উপায় নেই, কাছে গেলেই যে পুড়ে ছাই হয়ে যাবার ভয়। তাই ন'কোটি ঊনত্রিশ লক্ষ মাইল দূরে থেকে টান আর পাল্‌টা টানে পড়ে পৃথিবী অষ্টপ্রহর লাট্টুর মতো ঘুরছে আর ঘুরপাক খাচ্ছে সূর্যের চারপাশে।

আসলে সূর্য হল গনগনে আগুনের বিরাট একটা গোলা। এতো বিরাট যে তার মধ্যে অন্তত তেরো লক্ষ পৃথিবী হেসেখেলে ধরে যাবার কথা। এ-হেন বিরাট আগুনের গোলাটা এককালে ছুটে চলেছিলো আকাশের মধ্যে দিয়ে। কিন্তু ফাঁকা আকাশের এদিক-ওদিকে আরো অনেক

ওই রকম আগুনের গোলা আছে। তারাও সবাই সূর্যের মতো অবিরাম ছুটে চলে। রাত্তিরের অন্ধকার আকাশের দিকে চেয়ে দেখলে এই সব আগুনের গোলাকে দেখতে পাবে। কিন্তু এরা আমাদের চেয়ে এতো কোটি কোটি মাইল দূরে রয়েছে যে দেখতে ভয়ানক ছোট্ট ছোট্ট লাগে, মনে হয় মিটমিটে জোনাকী যেন! এদেরি নাম দেওয়া হয় 'তারা' বা তারকা।

বহুকাল আগে এই রকমই আগুনের একটা গোলা—আর একটা তারা বা সূর্য—ফাঁকা আকাশে ছুটতে ছুটতে এসে পড়েছিল আমাদের সূর্যের কাছাকাছি। সে যে কী সাংঘাতিক রসাতল তলাতল কাণ্ড তা ভাবতেই পারবে না। চাঁদ উঠবার সময় সমুদ্রের জল যে রকম ফুলে ওঠে, ফুলে ওঠে, ফেঁপে ওঠে, সেই রকমই ফুলে ফেঁপে উঠলো আমাদের সূর্যের বুকে গলা আগুনের ঢেউ। কিন্তু সে-জোয়ারের সঙ্গে আমাদের সমুদ্রের চুনোপুঁটি জোয়ারের কোনো তুলনাই হয় না। সূর্যের বুকের ওপরকার ঢেউটা নিশ্চই লম্বায় চওড়ায় লক্ষ মাইল হবে। আর শেষ পর্যন্ত অন্য সূর্যটার টানে এই ঢেউএর খানিকটা টুকরো ছিটকে বেরিয়ে গেলো আমাদের সূর্যটা থেকে। কিন্তু অন্য সূর্যটা চলে গেলো যেন পাশ কাটিয়ে। পিছনে পড়ে রইলো আমাদের সূর্য আর তার থেকে ছিট্‌কে-পড়া জ্বলন্ত টুকরো। আর ছিট্‌কে-পড়া সেই টুকরো ঘুরপাক খেতে লাগলো আমাদের সূর্যের চারপাশে। ঘুরপাক খেতে খেতে এই টুকরোটা আরো ছোট ছোট কতকগুলো টুকরোয় ভাগ হয়ে গেলো। আর

ছোট ছোট সব টুকরোগুলো দিনের পর দিন ঠাণ্ডা আর জমাট হয়ে আসতে লাগলো। এরই একটা টুকরোর নাম হয়েছে পৃথিবী। আমাদের এই পৃথিবী।

সূর্য থেকে ঠিকরে আসা ছোট্ট একটা টুকরো! আকাশে তো অমন কতোশত কোটি কোটি সূর্য। তবু এই ছোট্ট একটা টুকরোর মধ্যে,—আমাদের এই পৃথিবীতে,—এমন এক অবাক কাণ্ড ঘটেছে যা সারা আকাশের আর কোথাও ঘটেছে বলে জানা যায় নি। এই পৃথিবীর বুকে জন্মেছে এক আশ্চর্য জীব, তারই নাম মানুষ। মাথায় তার বুদ্ধি, হাতে তার হাতিয়ার। আর, মাথার বুদ্ধি খাটিয়ে, হাতের হাতিয়ার মজবুত করে ধরে মানুষ পণ করেছে পৃথিবীকে জয় করবার। দিনের পর দিন আর যুগের পর যুগ ধরে মানুষ জয় করে চলেছে পৃথিবীকে। এই দিগ্বিজয়ের কোনো শেষ নেই। শেষ নেই তাই মানুষের গল্পের।

প্রাণের জন্ম

পৃথিবী যখন সূর্য থেকে প্রথম ঠিকরে এলো তখন পৃথিবীর দশাও ওই সূর্যেরই মতো। শুধু আগুন আর আগুন : জল নেই, পাহাড় নেই, মাটি নেই, গাছ নেই। তারপর যতোই দিন যেতে লাগলো ততোই বদলাতে লাগলো আগুনের এই ছোট্ট গোলাটার চেহারা। অনেক অনেক

অনেক হাজার বছর পরে ঠাণ্ডা হয়ে এলো তার বাইরের দিকটা। আর তারপর দেখা দিলো পাহাড়, দেখা দিলো সমুদ্র, এই রকম আরো অনেক কিছু।

আর শেষ পর্যন্ত, পৃথিবীর জন্ম হবার প্রায় একশো কোটি বছর পরে, জলের মধ্যে তৈরি হল এক আশ্চর্য আর একেবারে নতুন ধরণের এক জিনিস। সেই জিনিসটার নাম দেওয়া হয় প্রোটোপ্লাজ্‌ম্‌।

প্রোটোপ্লাজ্‌ম্‌ কাকে বলে? কেমন করে তৈরি হল এই প্রোটোপ্লাজ্‌ম্‌?

এই কথাগুলো বুঝতে গেলে আরো অনেক গোড়ার কথা থেকে শুরু করতে হবে।

পৃথিবীর দিকে চেয়ে দেখলে আমরা দেখতে পাই হরেক রকমের জিনিস। লক্ষ লক্ষ রকমের জিনিস। আসলে কিন্তু মাত্র ৯২ রকমের জিনিস নানান ভাবে মিশেল খেতে খেতে এতো সব লক্ষ ধরণের জিনিস তৈরি করেছে। সেই ৯২ ধরণের জিনিসকে বলা হয় মৌলিক জিনিস: কোনটার নাম অক্সিজেন, কোনোটার নাম নাইট্রোজেন, কোনোটার নাম হাইড্রোজেন, কোনোটার নাম কার্বন। এই রকম, মাত্র ৯২টা জিনিস। যেমন ধরো, বাংলা ভাষায় কতোই তো কথা আছে। অভিধান খুলে দেখলে দেখতে পাওয়া যায় কতো হাজার কথা! কিন্তু এতো হাজার কথা তৈরি হয়েছে মাত্র গোটা কতক অক্ষর দিয়ে: অ, আ, ক, খ, এই ধরণের অক্ষর। পৃথিবীর বেলাতেও অনেকটা এই রকম। এখানকার এতো যে সব হাজারো রকমের জিনিসপত্র তার সব কিছুই তৈরি

হয়েছে ওই ৯২টা মৌলিক পদার্থের রকমারি মিশেল দিয়ে। তার মানে, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন, আর এই ধরণের বাকি ৮৮টা মৌলিক জিনিসকে পৃথিবীর বর্ণমালা বলা চলে। যেমন ধরো জল। জল তৈরি হয়েছে হাইড্রোজেন
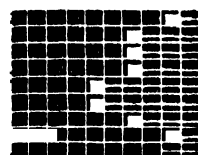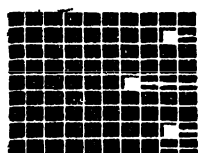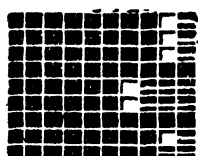
সমস্ত শব্দই যে-রকম কতকগুলি মূল অক্ষর দিয়ে গড়া তেমনি পৃথিবীর সমস্ত জিনিসই ৯২টি মূল পদার্থ দিয়ে গড়া। ইস্পাত, রুটি আর মাছ কী দিয়ে গড়া দেখো :

ইস্পাত — সিলিক্যান + ফস্‌ফরাস্‌ + কার্বন + ম্যাঙ্গেনিজ্‌ + সাল্‌ফার + আয়রণ

রুটি — হাইড্রোজেন + কার্বন + অক্সিজেন

মাছ — হাইড্রোজেন + কার্বন + ফস্‌ফরাস্‌ + সাল্‌ফার + নাইট্রোজেন + আয়রণ + ক্যাল্‌সিয়াম্‌

আর অক্সিজেন নামের দুরকম জিনিস মিলে। জলের মধ্যে দিয়ে ঠিকমতো বিদ্যুৎশক্তি চালিয়ে দিতে পারলে হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন-এর এই মিশেলটা ভেঙে যাবে, জলের বদলে

পাওয়া যাবে দু-ভাগ হাইড্রোজেন আর একভাগ অক্সিজেন। কিম্বা ধরো পাতে খাবার নুন। এই নুন তৈরি হয়েচে সোডিয়াম্ আর ক্লোরিন নামের অন্য দুরকম মৌলিক জিনিস দিয়ে। দেখতেই পাচ্ছ, এই সব মৌলিক জিনিসের আসল নামগুলো বড় খটোমটো। তাই ঠিক করা হয়েছে ছোট্টছোট্ট সোজাসোজা ডাক নাম দিয়ে এগুলোকে চেনবার। যেমন ধরো,
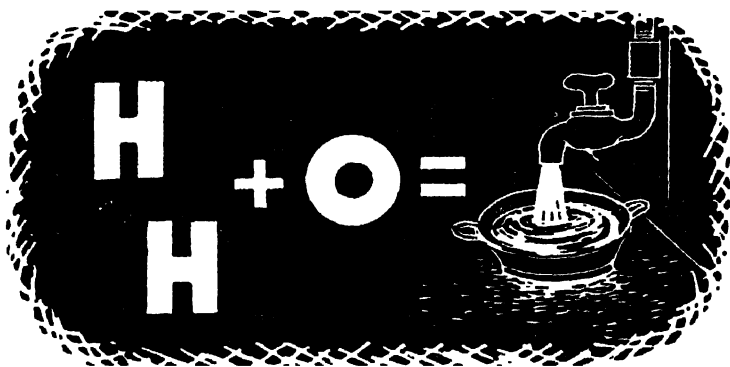
দুভাগ হাইড্রোজেন আর একভাগ অক্সিজেন মিলে জল তৈরি হয়। হাইড্রোজেনের ডাকনাম H, অক্সিজেনের ডাকনাম O। তাই H+H+O, কিম্বা, H_2+O= জল

হাইড্রোজেনর নাম শুধু H, নাইট্রোজেনের নাম শুধু N, অক্সিজেনের নাম শুধু O, সোডিয়ামের নাম Na, ক্লোরিনের নাম শুধু Cl। তাই, জলকে বলে H_2O: দুভাগ হাইড্রোজেন আর একভাগ অক্সিজেন। পাতে খাবার নুন-কে বলে NaCl: একভাগ সোডিয়াম আর একভাগ ক্লোরিন।

পৃথিবীর বাকি সব জিনিসের মতো ওই প্রোটোপ্লাজ্‌ম্‌ বলে জিনিসটাও তৈরি হয়েছে এই ভাবেই। তার মানে, হরেক রকম ওই মৌলিক জিনিস মিশেল খেতে খেতে তৈরী হয়েছে প্রোটোপ্লাজ্‌ম্‌। কিন্তু জলের মতো অমন সোজা নয়। কেননা, জল জিনিসটা তৈরি হয়েছে দুরকম মৌলিক জিনিস মিশে। কিন্তু প্রোটোপ্লাজ্‌ম্‌ তৈরি হয়েছে অনেক বেশী রকম মৌলিক জিনিস মিশে। তার মধ্যে প্রধান হলো কার্বন, নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন। কিন্তু এ ছাড়াও আরো নানান রকম জিনিস আছে। যেমন : ক্লোরিন, আয়রণ, ম্যাগ্‌নেসিয়াম, আয়োডিন, ক্যালসিয়াম্‌, ম্যাঙ্গেনিজ্‌ বোরোন —এই ধরনের আরো নানান সব মৌলিক জিনিস।

শুনতে তো ভয়ানক গুরুগম্ভীর লাগছে। এতো সব গাল ভরা ভরা নামের জিনিস মিশে তৈরী! তাছাড়া, প্রোটোপ্লাজ্‌ম্‌ নামটাও তো কম গালভরা নয়। কিন্তু এতো সব দাঁত ভাঙা নাম-টাম সত্ত্বেও প্রোটোপ্লাজ্‌ম্‌-এর চেহারাটা নেহাতই তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করবার মতো। কাঁচা ডিমের মধ্যেকার সাদা ভাগটা দেখেছো তো? সেই রকমেরই। পেছ্‌লা, স্বচ্ছ, নরম।

প্রায় লাখ পঞ্চাশেক বছর আগে, পৃথিবীর হরেক রকম মৌলিক জিনিস নানান ভাবে মিশ খেতে খেতে তৈরী হল এ হেন প্রোটোপ্লাজ্‌ম্‌, যার নামটা অমন গুরুগম্ভীর কিন্তু যার চেহারাটা নেহাতই তাচ্ছিল্য করবার মতো।

তা না হয় হোলো! কিন্তু তাতে কী এলো গেলো?

ওরে বাস্‌রে! ওই প্রোটোপ্লাজ্‌ম্‌ তৈরী হওয়াটা দারুণ জরুরী এক ব্যাপার। কেননা, পৃথিবীর যেখানে যতোরকম

প্রাণী বা জীবন্ত জিনিস তার সবই এই প্রোটোপ্লাজম্ দিয়ে গড়া —সমস্ত মাটির পাত্রই যেরকম মাটি দিয়ে গড়া, সেই রকমই।

তার মানে, প্রোটোপ্লাজম্ তৈরি হবার সময় থেকেই পৃথিবীতে জন্ম হল প্রাণের। তার আগে পর্যন্ত পৃথিবীর
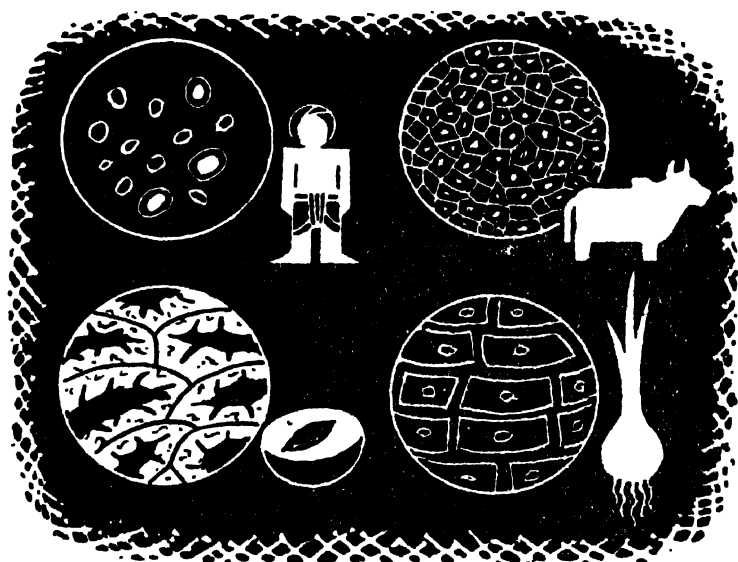
সমস্ত প্রাণীর দেহই কোষ দিয়ে তৈরি। ছবিতে নানান রকম কোষে-র চেহারা। ১ : মানুষের রক্ত যে কোষ দিয়ে তৈরি; ২ : গরুর যকৃৎ যে কোষ দিয়ে তৈরি; ৩ : ফলের বীজ যে কোষ দিয়ে তৈরি; ৪ : পেঁয়াজ যে-রকম কোষ দিয়ে তৈরি।

কোথাও প্রাণের চিহ্ন নেই। তার মানে কিন্তু এই নয় যে প্রোটোপ্লাজম্ তৈরি হবার সঙ্গে সঙ্গেই পৃথিবীর বুকে হাতী-ঘোড়ার দল ঘুরে বেড়াতে শুরু করলো। আসলে, পৃথিবীতে প্রথম যে প্রাণী দেখা দিলো তার চেহারা নেহাৎই তাচ্ছিল্য

করবার মতো: এক বিন্দু প্রোটোপ্লাজ্‌ম্‌, এতো ছোট যে খালি চোখে টিকিও দেখা যায় না। আর তার না আছে মুখ, না আছে হাত-পা—তার শরীরের যে-কোনো জায়গাই যেন কখনো তার পা, কখনো তার মুখ, কখনো পেট! আজকের দিনের পানা পুকুরের জলে এই রকমের প্রাণীর সন্ধান মেলে। অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে অনেক হাজার গুণ বড় করে তাদের দেখা যায় আর বোঝা যায় তাদের হালচাল। এই রকমের প্রাণীর নাম দেওয়া হয় এ্যামিবা।

পণ্ডিতেরা বলেন, এই ধরণের প্রাণীর শরীরে মাত্র একটি কোষ। তার মানে কী? কোষ আবার কাকে বলে?

সব রকম প্রাণীদের শরীরে সবচেয়ে সূক্ষ্ম অংশের নাম দেওয়া হয় "কোষ"। মানুষের শরীর থেকে এক বিন্দু রক্ত যোগাড় করো, অনুবীক্ষণ যন্ত্রের ভেতর দিয়ে ঠিক মতো দেখো। দেখবে তার মধ্যে খুব ছোট ছোট কিন্তু আলাদা আলাদা অংশ রয়েছে। কিন্তু শুধু মানুষের শরীর কেন? পেঁয়াজ বলো, গরুর যকৃৎ বলো, পীচ ফলের বীজ বলো,—যে কোনো রকম জীবন্ত জিনিষের যে কোন অংশকে ওই রকম ভাবে পরীক্ষা করো না কেন, দেখতে পাবে তা তৈরি হয়েছে ওই রকম ছোট্ট ছোট্ট আর আলাদা আলাদা অংশ মিলে। এই অংশগুলোকে বলে "কোষ"। তার মানে, সমস্ত মাটির পাত্রই যে-রকম শেষ পর্যন্ত মাটির দানা দিয়ে তৈরি, সেই রকম সমস্ত প্রাণীর দেহই তৈরি হয়েছে কোষ দিয়ে। পাঁঠা যে-ঘাস খাচ্ছে, সেই ঘাস তৈরি হয়েছে অনেক অজস্র কোষ দিয়ে; আমরা যে পাঁঠা খাচ্ছি সেই পাঁঠাও তৈরি হয়েছে অনেক অজস্র কোষ

দিয়ে। আবার আমাদের মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত সবটুকুই কোটি কোটি কোষ দিয়ে তৈরি।

কোষ অবশ্য এক রকমের নয়, হরেক রকমের।

কোষগুলো এতো ছোট ছোট যে খালি চোখে তাদের দেখতে পাবার উপায় নেই।

তাছাড়া, কোষ যতো রকমেরই হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত
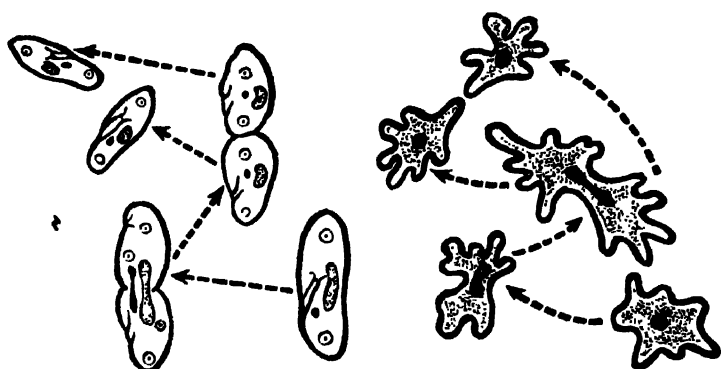
একটি কোষ থেকে দুটি কোষের জন্ম।
তীর চিহ্নগুলি অনুসরণ করে দেখো।

সব রকম কোষই যে-জিনিস দিয়ে তৈরি, তার নাম হল প্রোটো-প্লাজ্‌ম্‌। যেমন ধরো, সমস্ত মাটির পাত্রই শেষ পর্যন্ত মাটির দানা দিয়ে তৈরি, আবার সমস্ত মাটির দানাই শেষ পর্যন্ত মাটি দিয়ে তৈরি—অনেকটা সেই রকমই। তার মানে, হরেক রকম "কোষ" বলতে যেন বোঝায় প্রোটোপ্লাজ্‌ম্‌-এর হরেক রকম দানা। তাই বলে কিন্তু কোষগুলিকে দানা দানা আর শক্ত

শক্ত জিনিস বলে মনে করা চলবে না। তাছাড়া, আরো একটা কথা আছে। সমস্ত মাটির পাত্রই শেষ পর্যন্ত মাটির দানা দিয়ে তৈরি; কিন্তু তাই বলে প্রত্যেকটা মাটির দানাকে তো আলাদা-আলাদা ভাবে মাটির পাত্র বলা চলে না। কিন্তু কোষদের বেলায় অন্য কথা। সমস্ত প্রাণীর দেহই কোষ দিয়ে তৈরি; তবু প্রতিটি কোষকে আলাদা আলাদা ভাবে এক একটা প্রাণী বলতে হবে। কেননা, প্রাণ বলতে যে-সব লক্ষণ বোঝায় প্রত্যেকটি কোষের মধ্যেও সেই সব লক্ষণ রয়েছে। প্রত্যেকটি কোষ বাইরে থেকে নিজেদের জন্যে খাবার জোটায়, হজম করে সেই খাবার; সেই খাবারের পুষ্টিতে তাদের শরীর বাড়ে, খাবারের মধ্যে যে-অংশটা শরীরের কাজে লাগে না সেই অংশ শরীর থেকে বার করে দেয়। তাছাড়া, একটি কোষ থেকে জন্ম হয় দুটি কোষের; দুটি থেকে আবার চারটির—এই ভাবে কোষগুলি নিজেদের বংশ বাড়িয়ে চলে।

প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ বছর আগে পৃথিবীর বুকে অনেক রকম জিনিস মিশেল খেতে খেতে তৈরি হল প্রোটোপ্লাজম্। প্রোটোপ্লাজম্-এর ছোট্ট ছোট্ট বিন্দু। এক একটি কোষ। আর এরাই হোলো পৃথিবীর সব-প্রথম প্রাণী।

তারপর, যুগের পর যুগ ধরে নানান ভাবে এই সব আদিম প্রাণীগুলো বদলে চলেছে। বদলাতে বদলাতে, শেষ পর্যন্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে আজকের দিনের গাছপালা, আজকের দিনের পশু পাখী। তার মানে, আজকের দিনের ঘোড়াই বলো আর ঘোড়সওয়ারই বলো, সব কিছুই।

কেন এমন বদলালো? কেননা, এই হলো দুনিয়ার নিয়ম।

এই দুনিয়ার এমন মজা
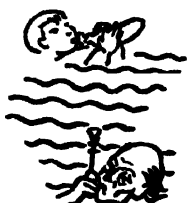
এই দুনিয়ার মজাই হল ওই। এখানে সব কিছুই বদলে যায়। তার মানে, আগে যে-রকম ছিলো সেই রকমটি আর থাকে না। অন্য রকম হয়ে যায়। এই বদলের একটুও বিরাম নেই।

এই তো সে-বছর কিনে আনলুম একটা ছাতা। কুচকুচে কালো রঙ। টাকের ওপর সেই ছাতা বাগিয়ে যখন রাস্তায় ঘুরে বেড়াই তখন মনটা গর্বে যেন নেচে ওঠে,—আড় চোখে চেয়ে দেখি আর পাঁচ জন চেয়ে দেখছে কি না। কিন্তু ও হরি! বছর তিনেক ঘুরতে না ঘুরতে দেখি আমার সেই নতুন ছাতাটা বদলে গিয়ে অন্য একটা ছাতা হয়ে গিয়েছে। কোথায় গেলো সেই কুচকুচে কালো রঙ, ঝলমলে সেই নতুন ছাতাটা! তার বদলে দেখি ছাতাটার রঙ হয়েছে ফ্যাকাশে হলদে মতো, চেহারাটা হয়েছে ধ্যাড়ধ্যাড়ে, নড়বড়ে—পুরনো ছাতার চেহারা যে-রকম হয়। হাতে নিতে ব্যাজার লাগে। রাস্তায় বেরিয়ে ভাবি, কেউ চেয়ে দেখছে না তো! না দেখলেই ভালো। নেহাৎ টাক-ফাটা রোদ, নইলে ওটাকে বয়ে বেড়াতে বয়ে যেতো।

ছিলো নতুন চটকদার ছাতা। সেটা বদ্‌লে অন্য ছাতা হয়ে গেলো। লক্কড় এক ছাতা!

কিন্তু কবে বদলালো? কখন বদলালো?—এই কথা ভেবে দেখতে গেলে একটু থতমত খেয়ে যাই। তাই তো! ছাতা-ছাড়া আমি এক পাও বেরোই না। তার মানে, রোজই ওই ছাতা হাতে বেরোচ্ছি। বেরোতে বেরোতে একদিন দেখি

নতুন ছাতাটি আর নেই। অথচ, রোজই মনে হয়েছে সেই ছাতাটাই। এমন তো নয়, যে একদিন ভোর বেলা উঠে দেখলাম সেই নতুন ছাতাটা রাতারাতি বদলে গিয়ে একটা পুরনো ছাতা হয়ে গিয়েছে। তাহলে ?

তাহলে মানতেই হবে ছাতাটা রোজই বদলেছে। কিন্তু এমন ভাবে বদলেছে যে চোখে পড়ে নি। তার মানে, বদলটা বড় মিহি। এমন মিহি যে চোখে ধরা পড়ে না। কিন্তু চোখে ধরা পড়ুক আর নাই পড়ুক বদলটা পুরো দমেই চলেছে। তার বিরাম নেই।

দুনিয়ায় বদলের শেষ নেই। বদলের বিরাম নেই। কিন্তু তার মধ্যে কতকগুলো বদল আছে যা আমাদের চোখে ধরা পড়ে, কতকগুলো বদল আছে যা আমাদের চোখে ধরা পড়ে না। হয়ত একদিন শুরু হল ভূমিকম্প: পাহাড়ের চূড়ো দিয়ে ঠিকরে বেরোতে লাগলো আগুনের হল্‌কা, কাঁপতে শুরু করলো পৃথিবীর বুক আর সেই কাঁপুনীতে চিড় খেয়ে দু'ফাঁক হয়ে গেলো একটা পাহাড়, ফেটে চৌচির হয়ে গেলো একটা বিরাট মাঠ। সকাল বেলায় উঠে দেখি পাহাড়টা যেরকম ছিলো সে-রকম আর নেই, মাঠটা যে-রকম ছিলো সে-রকম আর নেই! বদলে গিয়েছে। অন্য রকম হয়ে গিয়েছে। এই যে বদল, এ-বদলকে চোখে দেখতে পাওয়া গেলো। কিন্তু সব রকমের বদল এই রকমের নয়। কতকগুলো বদল এমন মিহি আর এমন আস্তে আস্তে হয় যে সেগুলোকে চোখে দেখতে পাওয়া যায় না। আজকে দেখলাম একটা ছেলে রাস্তায় ডাং-গুলি পিটছে। কিন্তু বছর কতক পরে দেখবো

সেই ছেলেটা আর সেই ছেলেটা নেই। ফিটফাট এক ভদ্রলোক হয়ে গিয়েছে, গটগট করে আপিস চলেছে। তার পর, আরো কিছু বছর পরে যদি তাকে দেখি তাহলে দেখবো সেই মাঝবয়সী আপিসের বাবুও আর নেই! তার বদলে একটি বুড়ো থুথুড়ে লোক রোয়াকে বসে নাতীদের রূপকথা শোনাচ্ছে।

কিন্তু সেই ডাং-গুলি খেলোয়াড় বদলে গিয়ে কবে এই
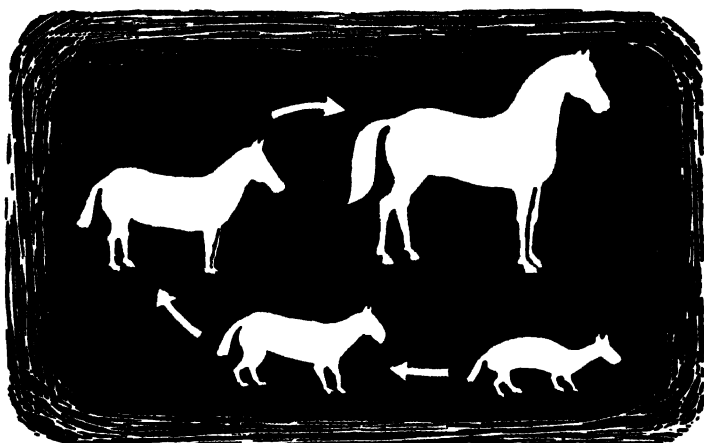
ইয়োহিপাস্ থেকে আজকালকার ঘোড়া

দাদু হয়ে গেলো? নিশ্চয় রোজই বদলেছে, সব সময় ধরে বদলেছে, প্রতি মুহূর্তে বদলেছে। কেবল বদলটা এমন মিহি যে চোখে ধরা পড়ে না।

পৃথিবীতে যতো সব গাছ পালা, জীব জন্তু, সব কিছুর বেলাতেই এই কথা। সব কিছুই বদলে যাচ্ছে। অবিরাম বদলে যাচ্ছে। কেবল, সেই বদল এমন মিহি যে আমাদের চোখে ধরা পড়ে না। তবে এই বদলটা শুধু কচি বয়েস

বদ্‌লে বুড়ো বয়েস হয়ে যাবার মতো বদল নয়। কচি-বয়েস বদলে বুড়ো-বয়েস হবার কথা তো আছেই। তাছাড়াও আরো একরকম বদল আছে। সেইটাই দারুণ মজার। সেটা হল, এক রকম জানোয়ার বদলে বেবাক আর এক রকম জানোয়ার হয়ে যাবার ব্যাপার। যেমন ধরো, অনেকদিন আগে এক রকমের জানোয়ার ছিলো, সেগুলোকে যেন শেয়ালের মতো দেখতে। তাদের নাম দেওয়া হয় ইয়োহিপাস্‌। অনেক হাজার বছর ধরে সেই জানোয়ারগুলোর বংশ বেড়ে চলেছে: বাচ্চার পর বাচ্চা, আবার তার বাচ্চা, তাদের বাচ্চা—এই রকম অনেক অনেক দিন ধরে। আর শেষ পর্যন্ত সেই অদল বদলের ফলে ওই জানোয়ারদের চেহারা বদলে গিয়ে একেবারে অন্য-রকম হয়ে গেলো। কী-রকম হয়ে গেলো তা শুনলে অবাক হয়ে যাবে। কেননা, আজকের দিনে যে-সব ঘোড়া চিঁহি চিঁহি করছে আর ঘাস খেয়ে ঘুরছে সেই ঘোড়াগুলোই হল ওই অনেক হাজার বছর আগেকার শেয়ালের মতো দেখতে ছোট ছোট ইয়োহিপাস্‌দের বংশধর।

দুনিয়ায় ক্রমাগতই এই রকম ব্যাপার চলেছে। এক রকমের জানোয়ার বদলাতে বদলাতে শেষ পর্যন্ত অনেক হাজার বছর পরে একেবারে অন্য রকমের জানোয়ার হয়ে যায়। তবে জানোয়ারগুলোর দিকে তুমি-আমি এমনি যদি চেয়ে দেখি তাহলে এই বদলটা আমাদের চোখে পড়বে না। বড় মিহি এই বদল। কিন্তু, তুমি-আমি যদি চোখে দেখতে না পাই তাহলে এই বদলের খবরটা জোগাড় করলো কে? ওঃ, সে এক ভারি মজার ছেলে। তার নাম চার্লস্‌ ডারউইন্‌।

এক যে ছিলো অবাক ছেলে

বাপ বললে, পদ্য লিখতে শেখো। কিন্তু পদ্য লেখায় ছেলের মন নেই। কুঁতিয়ে কুঁতিয়ে যেটুকু বা লিখলো তা নেহাৎই অচল, আজেবাজে পদ্য।

বাপ বললো, তাহলে ডাক্তারী পড়ো। কিন্তু ডাক্তারী পড়ায় ছেলের মন নেই। তাই ডাক্তারী শেখাও হয়ে উঠলো না।

তাহলে পাদ্‌রী হবার চেষ্টা দেখো, বাপ বললে। পাদ্‌রীদের কাছে লেখাপড়া শিখে পাদ্‌রী হবার ব্যবস্থা। কিন্তু পাদ্‌রী হওয়ায় ছেলের মন নেই। তাই এ-বিদ্যেও বেশী দূর গড়ালো না।

বাপ বললে, ওর দ্বারা কিস্‌সু হবে না।

দিদি বললে, ওর দ্বারা কিস্‌সু হবে না।

কিন্তু দেখা গেলো ওর দ্বারাই হল। আর এমন দারুণ ব্যাপার হল যা পালেপার্বণেও হয় না। কেননা, বড় হয়ে এই ছেলেটি যে-সব কথা আবিষ্কার করলো তাই শুনে পৃথিবীর সমস্ত পণ্ডিতদের মাথা একেবারে ঘুরে গেলো।

ছোট্ট বয়েস থেকেই ছেলেটির দারুণ উৎসাহ পোকা-মাকড়, গাছপালা আর পশুপাখীর ব্যাপারে। পাখীর ডিম খুঁজতে খুঁজতে সারাটা দিন কেটে যায়। ভোর বেলায় শিকারে বেরোবার কথা থাকলে মাথার কাছে জুতো জোড়া নিয়ে ঘুমোয়, রাত পোয়াতে না পোয়াতে জুতো পরে ফিটফাট। আর নতুন ধরনের কোনো পোকা মাকড় দেখলে ছেলেটি আনন্দে যেন

দিশেহারা হয়ে যায়। একবার হয়েছিলো কি, ছেলেটি দেখলো একটা গাছের গুঁড়িতে তিনটে নতুন ধরণের পোকা। ছেলেটি দুহাত দিয়ে খপ খপ করে দুটো পোকা ধরে ফেললো। এদিকে তিন নম্বরের পোকাটা পালিয়ে যায় যায়! কিন্তু দুটো হাতই যে দুটো পোকায় জোড়া। তাহলে? ছেলেটি করলো কি, খপ করে ডান হাতের পোকাটা নিজের মুখের মধ্যে পুরে ফেললো আব ডান হাত দিয়ে চেপে ধরলো তিন নম্বরের পোকাটা। ছেলে-ধরার গল্প শুনেছো, কিন্তু এরকম পোকা-ধরা ছেলের গল্প কখনো শোনো নি নিশ্চয়ই।

ছেলেটির নাম চার্লস্ ডারউইন। প্রায় শ' দেড়েক বছর আগে—১৮০৯ খৃষ্টাব্দে—তার জন্ম।

ডারউইনের তখন বছর একুশ বয়েস। খবর এলো, বিগল্ বলে একটা জাহাজ পৃথিবী ঘুরতে বেরোচ্ছে। জলপথে দেশ-বিদেশে সওদাগরী জমাবার পথ বার করাই এর উদ্দেশ্য। কিন্তু জাহাজের ক্যাপ্টেন বলছেন, দেশবিদেশ ঘুরে বিজ্ঞানের খবর জোগাড় করতে কেউ যদি রাজি থাকে তাহলে তাকে এই জাহাজে নিয়ে ঘোরানো যেতে পারে। খবর পেয়ে ডারউইনের তো মহা উৎসাহ। অনেক রকম কাকুতি-মিনতি করে বাবাকে কোনো মতে রাজি করানো গেলো। ডারউইন চললো ক্যাপ্টেনের সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু ডারউইনের থ্যাবড়া নাক দেখে ক্যাপটেন ভাবলো এর দ্বারা কিস্সু হবে না; একে নিয়ে গিয়ে লাভ কী? যাই হোক, শেষ পর্যন্ত ক্যাপ্টেনেরও মন গললো। রওনা হল বিগল্।

এ-দেশ থেকে ওদেশ। এ-দ্বীপ থেকে ও-দ্বীপ। পুরো

পাঁচ বছর ওই জাহাজে। আর ডারউইন প্রাণ ভরে নানান রকমের ব্যাপার দেখতে লাগলো : পোকা মাকড় আর গাছপালা আর পশু-পাখী আর পাহাড়-পর্বত সংক্রান্ত ব্যাপার। নজর করবার মতো যা দেখে খুঁটিয়ে লিখে রাখে। আর খুব খুঁটিয়ে দেখে বলেই যা আর পাঁচজনের চোখে পড়ে না তা ডারউইনের চোখে পড়ে।

তারপর বিগ্‌ল্ জাহাজ দেশে ফিরে এলো। কিন্তু ডারউইনের কাজের কামাই নেই, দেখার কামাই নেই। আরো বিশ বছর ধরে জন্তুজানোয়ার আর পোকামাকড় আর পাহাড়পর্বত আর গাছপালার ব্যাপার দেখা। জরুরী ধরণের যা কিছু দেখছে তাই লিখে রাখছে, লিখতে লিখতে খাতার পর খাতা ভরে যায়।

আর তারপর, এতো সব চোখে দেখা ব্যাপারের নজির নিয়ে বেরুলো ডারউইনের বই। সে-বই পড়ে পৃথিবীর সব পণ্ডিতদের মাথা একেবারে ঘুরে গেলো। শুরু হল দুনিয়া জোড়া হৈ চৈ। এমন হৈ চৈ আর কোনো বই নিয়ে পড়েছে কিনা সন্দেহ।

কিন্তু এতো হৈ চৈ কেন? কী লেখা আছে ওই বইতে?

হৈ চৈ তো হবেই। কেননা, এর আগে পর্যন্ত সবাই যে-কথা ভাবতো, যে-কথা মানতো, ডারউইন প্রমাণ করে দিলেন সে-সব একদম ভুল কথা। এর আগে পর্যন্ত সবাই ভাবতো, পৃথিবীর বুকে এতো যে সব লক্ষ লক্ষ প্রাণী তা সবই ভগবানের সৃষ্টি। ভগবান সৃষ্টি করেছেন হাতী আর ঘোড়া, ব্যাঙ আর রাজহাঁস আর শুঁয়োপোকা আর নটে

শাক—সব কিছুই আলাদা আলাদা করে সৃষ্টি করা। তার মানে, মানুষের সঙ্গে শুঁয়োপোকার কিম্বা ব্যাঙের কোনো সম্পর্ক নেই। মানুষ হল এক রকম আর ব্যাঙ হল আর এক রকম। একেবারে আলাদা।

ডারউইনের বইতে প্রমাণ হয়ে গেলো, মোটেই তা নয়। এখন এই যে এতো রকম জীবজন্তু আর গাছপালা—এগুলোকে ভগবান সৃষ্টি করেছেন, একথা বলবার কোনো মানে হয় না। কেননা, আসল ব্যাপারটা হল একেবারে অন্য রকমের ব্যাপার। অনেক অনেক বছর ধরে আদিম প্রাণীরা নানান দিকে নানান ভাবে বদলাতে বদলাতে আজকের দিনের এতো সব লক্ষ লক্ষ রকমের প্রাণী হয়ে গিয়েছে। তার মানে, আজকের দিনের এতো রকম সব প্রাণীর একই পূর্বপুরুষ।

কিন্তু প্রমাণ কী?

প্রমাণ আসলে অনেক রকমের।

ডারউইনের বইতে অনেক রকম প্রমাণ আছে।

তাছাড়া, ডারউইনের পর আরো অনেকে আরো অনেক রকম ব্যাপার দেখেশুনে আরো নানান-রকম প্রমাণ জোগাড় করেছেন।

সে-সব প্রমাণের কিছুকিছু নমুনা দেওয়া যাক।

কঙ্কালে কঙ্কালে ভাই-ভাই
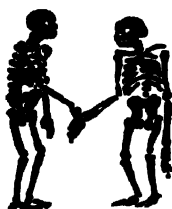
আমরা যাকে বলি "আগুন", হিন্দুস্থানীরা তাকেই বলে "আগ"। এই দুটো কথার মধ্যে খুব মিল রয়েছে। তার মানে, একই কথা থেকে এই দুটো কথা এসেছে। সেই কথাটা হল "অগ্নি", সংস্কৃত কথা। তার থেকেই বাংলায় হয়েছে "আগুন", হিন্দিতে "আগ"। তাই জন্যেই "আগুন" আর "আগ" এই দুটো কথার মধ্যে অতোখানি মিল, যেন ভাই-ভাই ভাব।

প্রাণীদের বেলাতেও অনেকটা এই রকম। ধরো একটা সিম্পাঞ্জী আর একটা মানুষ। এদের মধ্যে কি খুব বেশী মিল আছে? যদি থাকে তাহলে মানতে হবে এদের মধ্যেও যেন একরকম ভাই-ভাই সম্পর্ক। তার মানে একই জানোয়ার থেকে এসেছে এই দু'রকমের জানোয়ার। যেমন, "অগ্নি" থেকে এসেছে "আগুন" আর "আগ", দুটো কথাই।

কিন্তু মিল কোথায়? এমনিতে চেয়ে দেখলে মনে হয় একদম আলাদা। সিম্পাঞ্জীর গায়ে লোম, পেছনে লেজ; মানুষের লোমও নেই, লেজও নেই। তাহলে? আসলে কিন্তু তা নয়। এমনিতে যতো তফাৎই মনে হোক না কেন, এদের দুজনের দুখানা কঙ্কাল দেখো। দুটো কঙ্কালের গড়নই অনেকখানি একরকম। কঙ্কালে কঙ্কালে যেন ভাই ভাই সম্পর্ক।

তার থেকে কী প্রমাণ হয়? প্রমাণ হয় যে, এদের দুজনেরই পূর্বপুরুষ এক ছিলো। আমার জ্যেঠতুতো ভাইয়ের

সঙ্গে আমার যে-রকম সম্পর্ক অনেকটা সেই রকমই। আমাদের দুজনেরই ঠাকুর্দা এক।

মানুষ আর সিম্পাঞ্জীর সেই যে এক পূর্বপুরুষ সে হল এক রকমের বনমানুষ। সেরকম বনমানুষ আজকাল আর দেখতে পাওয়া যায় না। কিন্তু সেই বনমানুষের বংশধররাই নানান দিকে নানান ভাবে বদলাতে বদলাতে শেষ পর্যন্ত কেউ বা হয়েছে সিম্পাঞ্জী, কেউ বা হয়েছে মানুষ। তাই মানুষের সঙ্গে সিম্পাঞ্জীর কঙ্কালের এমন ভাই-ভাই ভাব।

কিন্তু ধরো, একটা মানুষ আর একটা ব্যাঙ। এমনিতে তো মনে হয় দুজনের মধ্যে কোনো রকমই মিল নেই। কিন্তু তাই বললেই কি হয়? কঙ্কাল দুটোর ছবি ভালো করে দেখো, দুজনের কঙ্কালের গড়নে যে মিল রয়েছে তা মানতে বাধ্য হবে। তার মানে, ব্যাঙের সঙ্গেও আমাদের সম্পর্ক রয়েছে; কিন্তু সেটা হল বড়ই দূর সম্পর্ক। যেমন ধরো, তোমার ঠাকুর্দার ঠাকুর্দার যে জ্যেঠতুতো ভাই তার নাতীর নাতীর সঙ্গে তোমার যেমন সম্পর্ক। কাছেপিঠের সম্পর্ক নিশ্চয়ই নয়; তবু সম্পর্ক যে একেবারে নেই তাও তো বলা চলবে না।

তার মানে, আমাদের অনেক অনেক অনেক আগেকার এক পূর্বপুরুষ আর ব্যাঙদের পূর্বপুরুষ একই ছিলো। সেই পূর্বপুরুষদের নাম শুনলে তুমি চমকে উঠবে। তাদের নাম মাছ। কেননা মাছরাই হল পৃথিবীর প্রথম শিরদাঁড়াওয়ালা প্রাণী। অনেক লক্ষ বছর ধরে এই শিরদাঁড়াওয়ালা প্রাণীদের নানান দল নানান দিকে বদলাতে বদলাতে কেউ বা হয়েছে

ব্যাঙ, কেউ বা হয়েছে খরগোস, কেউ বা গণ্ডার, আবার কেউ বা হয়েছে বাঁদর। এই রকম কতোই রকম। তার মানে, এই
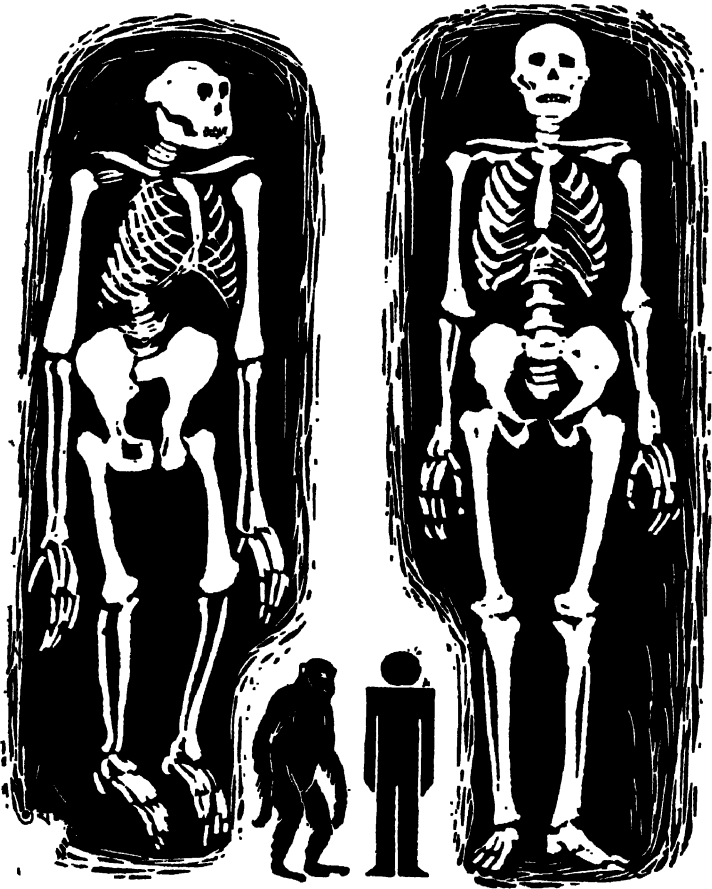
সব জানোয়ারদের মধ্যে আত্মীয়তা রয়েছে, সম্পর্ক রয়েছে। কারোর কারোর বেলায় সম্পর্কটা খুব দূর সম্পর্ক। মানুষের সঙ্গে

গণ্ডারের সম্পর্কটা নেহাতই দূর সম্পর্ক। কিন্তু গণ্ডারের সঙ্গে শূয়োরের সম্পর্কটা বেশ কাছে-পিঠের সম্পর্ক, যে রকম কাছে-পিঠের সম্পর্ক হল মানুষের সঙ্গে গেরিলা আর সিম্পাঞ্জী আর ওরাঙ ওটাঙ-এর সম্পর্ক।

এদের সবাইকার কঙ্কালগুলো ভালো করে মিলিয়ে দেখলে কথাটা না-মেনে আর উপায় থাকে না।
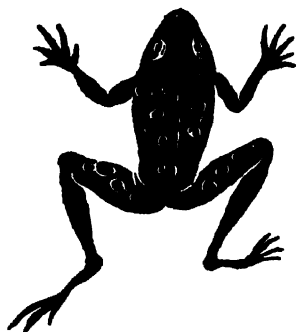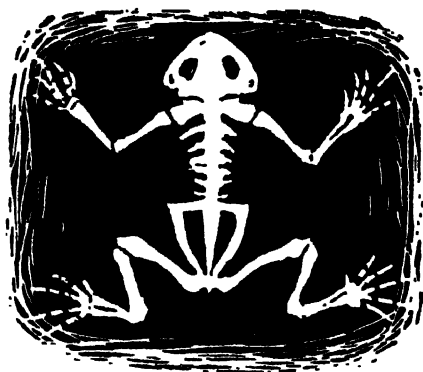
তোমার যখন লেজ ছিলো
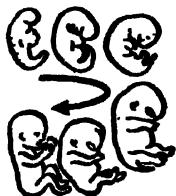
এইবারে তুমি নিশ্চয়ই রীতিমতো ক্ষেপে উঠবে। সিম্পাঞ্জীই হোক আর গেরিলাই হোক আর ওরাঙ ওটাঙ-ই [illegible] সেই ওদের তো সবাইকার লেজ [illegible] ম ওদের গা গুলো লোমে ভর্তি [illegible] আর ওদের সঙ্গে তোমার কি না খুব কাছেপিঠের সম্পর্ক! এ কথা শুনলে মেজাজ বিগড়ে যায় না কি?

তা হয়ত যায়। কিন্তু কথা হল, মেজাজ বিগড়ে লাভ নেই। কেননা লেজই বলো আর লোমই বলো—এ সবকে ঘেন্না করেই বা কী হবে? এককালে, তোমার গায়েও লোম ছিলো, তোমার পেছনেও একটি ছোট্ট লেজ ছিলো। কবে জানো? তুমি যখন তোমার মায়ের পেটের মধ্যে ছিলে। তাই
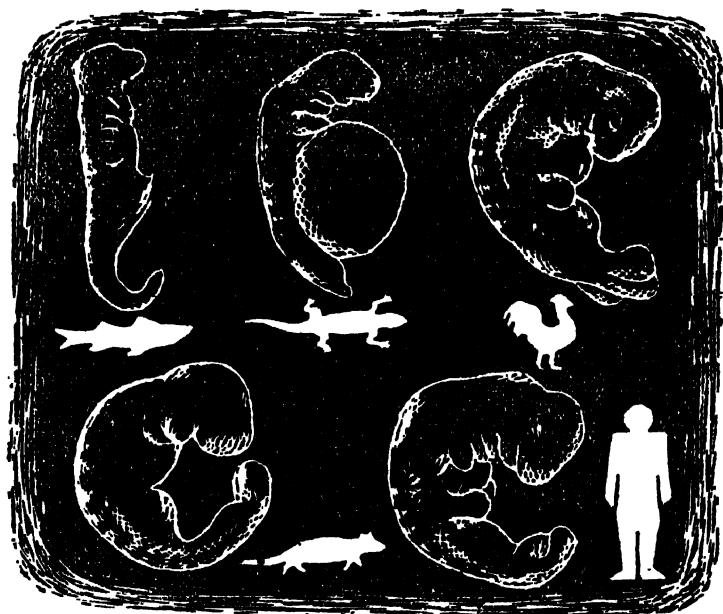
তখনকার কথা কিছুই তোমার মনে নেই। কিন্তু ছিলো। লেজও ছিলো, লোমও ছিলো। তখন তোমার চেহারাটা এত্তোটুকু—এক ইঞ্চির তিন ভাগের এক ভাগ মাত্র। কিন্তু এইটুকু চেহারার তুলনায় তোমার লেজটি বেশ বড়সড়োই। পুরো শরীরটা লম্বায় যতখানি, তার ছ' ভাগের এক ভাগ

হলো তোমার লেজ! পেটের মধ্যে যখন তোমার পাঁচ সপ্তাহ বয়েস তখন এই লেজটি দেখা দিয়েছে, কিন্তু বড় হতে হতে তুমি যখন আট সপ্তাহের হলে তখন ওই লেজটা মিলিয়ে গেলো।

শুধু লেজ নয়। লোমও ছিলো। মার পেটের মধ্যে যখন তোমার সাত মাস বয়েস তখন তোমার সারা গা লোমে ভরতি। সোনালী রেশমী লোম। তারপর, জন্ম হবার ঠিক মুখোমুখি সময়েই গা থেকে এই সব লোম ঝরে গিয়েছে।

শুধু লেজ আর লোম কেন? মাছদের কান্‌কো কাকে বলে জানো তো? মাথার দুপাশে দুটো যন্ত্র যা দিয়ে মাছরা নিঃশ্বাস নেয়। তুমি কি জানো যে এককালে তোমার নিজের শরীরেও এই রকমের কান্‌কো ছিলো? কী করে জানবে বলো? তখনো যে তুমি তোমার মায়ের পেটের মধ্যে!

আসলে, যে-সব জানোয়ারের পূর্বপুরুষ এক আর যাদের মধ্যের সম্পর্কটা বেশ কাছেপিঠের সম্পর্ক তারা যখন তাদের মায়ের পেটের মধ্যে কিম্বা ডিমের মধ্যে থাকে, তখন তাদের চেহারায় আশ্চর্য মিল। এই মিল থেকেই প্রমাণ হয় তাদের পূর্বপুরুষ এক। তার মানে, একই জানোয়ার পৃথিবীর বুকে নানান ভাবে বদলাতে বদলাতে নানান রকমের জানোয়ার হয়ে গিয়েছে! মার পেটের মধ্যে কিম্বা ডিম ফুটে বেরুবার আগে কার কী রকম চেহারা তা ওপাতার ছবিটা থেকেই আন্দাজ করতে পারবে। ছবিতে দেখো: মাছ, টিকটিকি, মুরগী, ইঁদুর

আর মানুষের ছানা—পৃথিবীতে পা দেবার আগে কার কেমন চেহারা। এবার তুমি নিজেই বলো, খুব কিছু তফাৎ আছে কি ?

পাহাড়ের বই

পৃথিবীর বুকে অনেক পাহাড়। অনেক রকমের পাহাড়। তার মানে, সব পাহাড় এক রকমের নয়। এতো রকম পাহা-ড়ের মধ্যে এক রকম পাহাড়ের নাম হল পাললিক পাহাড় বা পলিপড়া পাহাড়। এই পাহাড়-গুলো এক রকম বইয়ের মতো। তার মানে নিশ্চয়ই কাগজের ওপর কালি দিয়ে ছাপা জিনিস নয়। তবু বইয়ের মতোই। যেন ইতিহাসের বই। কেননা, ইতিহাসের বই থেকে অনেক যুগের অনেক রকম খবর পাওয়া যায়। রাজা অশোক কবে জন্মেছিলেন, কী রকমের লোক ছিলেন। কিম্বা, কী রকম ছিলো আমাদের দেশের অবস্থা নবাবী আমলের আগে। এই রকম সব পুরনো খবর যোগানোই তো ইতিহাসের বইয়ের আসল কাজ। পাললিক পাহাড়গুলোর বেলাতেও ঠিক তাই। এগুলোর মধ্যে থেকেও অনেক অনেক খবর পাওয়া যায়, বহুদিন আগেকার সব খবর।

ছ'কোটি বছর আগে পৃথিবীর বুকে কোন্ ধরণের জীবজন্তু ঘুরে বেড়াতো ? আজকাল যে-রকম ঘোড়া আমাদের গাড়ি টানছে, তখনকার কালে কি সেই রকমের ঘোড়া ছিলো ?

আজকাল জানতে পারা গিয়েছে—না, সেকালে মোটেই এরকমের ঘোড়া ছিল না। তখনকার কালে পৃথিবীর কোথাও এ-রকম ঘোড়ার চিহ্ন ছিলো না। তার বদলে ছিলো এই ঘোড়া-দের পূর্বপুরুষ। কিন্তু সেই পূর্বপুরুষদের দেখতে একেবারে অন্য রকম। আগেই বলেছি ছোটখাটো শেয়ালের মতো তাদের চেহারা, মাটির থেকে তাদের পিঠ বড় জোর এক হাত উঁচু হবে। আর তাছাড়া এদের পায়ে ঘোড়ার ক্ষুর ছিল না ; তার বদলে সামনের পায়ে চারটে করে আঙুল আর পেছনের পায়ে তিনটে করে আঙুল। একেবারে অন্যরকমের চেহারা নয় কি ? ঘোড়ার এই পূর্বপুরুষদের নাম ইয়োহিপাস্। তার মানে, ছ'কোটি বছর ধরে নানান ভাবে বদলাতে বদলাতে সেই ইয়োহিপাসের বংশধররা আজকালকার ঘোড়া হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু জানা গেলো কোথা থেকে ? ওই পাহাড়ের বই থেকে। যেগুলোর নাম দেওয়া হয় পাললিক পাহাড়। কিন্তু কেমন করে জানা গেল ? এ-কথার উত্তর বুঝতে গেলে প্রথমে ভেবে দেখতে হবে এই পাহাড়গুলো জন্মালে কেমন করে।

তুমি তো জানোই, পৃথিবীর সমস্ত নদী বয়ে চলেছে সমুদ্রের দিকে। কিন্তু নদীগুলোর স্রোত সবজায়গায় সমান জোর নয়। যেখানে ঢালুর দিকে স্রোত সেখানে তোড় খুব বেশী ; যেখানে সমতল জমি, কিম্বা যেখানে স্রোতের মুখে কোনো বাধা নেই, সেখানে তোড় অনেক কম।

এখন ব্যাপারটা হল এই যে নদীগুলো খালি হাতে সমুদ্রের দিকে ছুটছে না। পৃথিবী ধুয়ে, পৃথিবীর বুক থেকে নানান রকমের জিনিস বয়ে নিয়ে চলেছে সমুদ্রের দিকে। মাটি আর

ধাতু, গাছ-পাতা, শামুক গুগ্‌লী, মরা জন্তু জানোয়ার—এমনি কতো কি। স্রোতের তোড়টা যেখানে কম সেখানে নদীর মধ্যেকার এই সব জিনিসগুলো থিতিয়ে মাটিতে জমতে থাকে। এই ভাবে, অনেক দিন ধরে বেশ পুরু একথাক জিনিস নদীর তলায় থিতিয়ে বসলো। তারপর আবার অনেক দিন ধরে তার ওপরে থিতিয়ে বসলো আর এক থাক। এই ভাবে, যুগের পর যুগ ধরে থাকের পর থাক জমতে থাকে। তারপর, ওপরের দিকের থাকগুলোর চাপে তলার দিকের থাকগুলো আস্তে আস্তে পাথর হয়ে যায়। সেই পাথরের যে পাহাড় তারই নাম হল পাললিক পাহাড়।

পাললিক পাহাড়গুলোকে তাই দেখতে ভারি মজার ধরনের। যেন একটা পাথরের চাদরের ওপর আর একটা পাথরের চাদর, তার ওপর আর একটা—এই রকম উপরি উপরি, থাকে থাকে সাজানো। এই রকমের পাহাড় দেখেছো কখনো? দেখতে পাওয়া এমন কিছু কঠিন নয়। কিন্তু মনে রেখো, যেখানেই এই রকমের পাহাড় সেখানেই বহুযুগ আগে হয় নদী ছিলো, না হয় সমুদ্র ছিলো। আসলে, পৃথিবীর বুকের ওপর অদলবদলের তো বিরাম নেই। অনেক সময় ভূমিকম্প-টুমিকম্পর মতো অনেক রকম রসাতল তলাতল কাণ্ড হয়ে পৃথিবীর ওপরকার চেহারাটা একেবারে বদলে গিয়েছে। আগে যেখানে মহাসমুদ্র ছিলো সেখানে হয়ত জেগে উঠেছে মহাদেশ: বিরাট মাঠ, বিরাট পাহাড়, এমনি কতো কী! সমুদ্র সরে গিয়েছে, নদী সরে গিয়েছে, আর জেগে উঠেছে ওই সব পাললিক পাহাড়।

এই পাললিক পাহাড়গুলোর আগাগোড়া বয়েস সমান নয়। যতো চূড়োর দিক ততো বয়েস কম, যতো নীচুর দিক ততো বয়েস বেশী। তা তো হবেই। কেননা, যতো ওপরের দিক ততোই নতুন পাথরের থাক। নানান রকম কায়দাকানুন করে এই পাললিক পাহাড়গুলোর বয়েস বের করে ফেলা যায়। পাহাড়গুলোর বয়েস মানে কোন থাকটার কতো বয়েস তাই।
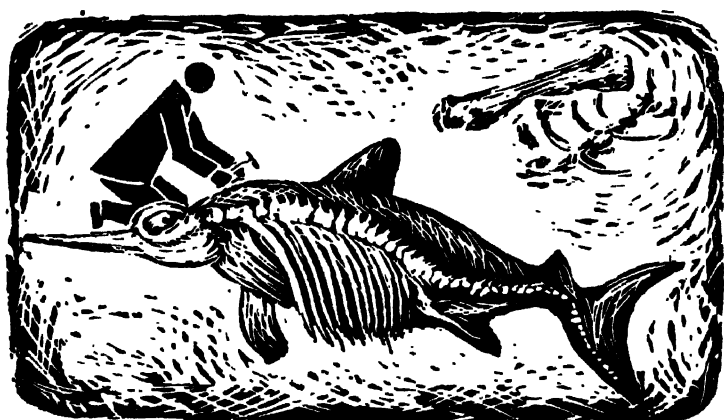
পাথর খুঁড়ে একটা মাছের ফসিল খুঁজে পাওয়া!

আরো মজার ব্যাপার আছে। পাহাড়গুলোর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় একরকমের জিনিস, সেগুলোকে বলে ফসিল।

ফসিল আবার কী? পাললিক পাহাড়গুলোর মধ্যে যেন নানান রকমের মূর্তি ঠাসা রয়েছে। কোনোটা ঠিক গাছের পাতার মতো, কোনোটা বা হুবহু শামুকের মতো, কোনটা বা মাছের মতো, অন্য কোনো জীবজন্তুর হাড়ের মতো কোনটা বা।

হরেক রকম সব জিনিস। পাথরের তৈরি হুবহু মূর্তির মতো। এইগুলোকেই বলে ফসিল। যদি কখনো যাদুঘরে বেড়াতে যাও তাহলে নিজের চোখে দেখে এসো ফসিলগুলো কী রকম দেখতে হয়। যাদুঘরে অনেক সব ফসিল সাজানো থাকে।

কিন্তু কথা হল, এগুলো এলো কোথা থেকে? আগেই বলেছি, নদীগুলো পৃথিবীর বুকের ওপর থেকে ধুয়ে নিয়ে যায় হরেক রকমের জিনিস। এই সব জিনিসের মধ্যে গাছ পাতা রয়েছে, শামুকগুগ্‌লি রয়েছে, রয়েছে নানান রকম জীবজন্তুর মরা শরীর। যেখানে নদীর স্রোত একটু থিতিয়েছে, সেখানে নদীর জলের সঙ্গে মেশানো সব জিনিসগুলো নদীর তলার দিকে জমতে শুরু করে: বালি, মাটি, নানান রকমের ধাতু। সেইগুলো জমতে জমতেই তো শেষ পর্যন্ত পাললিক পাহাড় হয়। তাই এই সব জিনিসগুলো যখন মাটির তলায় থিতিয়ে বসছে তখন তার সঙ্গে নিশ্চয়ই থেকে যাচ্ছে কিছু কিছু গাছ পাতা, কিছু কিছু শামুক গুগ্‌লী, কিছু কিছু মরা মাছ, মরা জন্তুজানোয়ারের শরীর। এতো সবের মধ্যে অবশ্য বেশীর ভাগই পচে যায়। সেগুলোর আর কোন চিহ্ন থাকে না। কিন্তু নানান কারণে কতকগুলো পচে না, নষ্ট হয় না। তার বদলে পাথর হয়ে যায়। যেগুলো পাথর হয়ে যায় সেগুলোরই নাম হল ফসিল। ঠিক যেমনটি গাছের পাতা ছিলো তেমনটিই দেখতে রয়েছে, কেবল পাথর হয়ে গিয়েছে। তাই মনে হয় যেন পাথরের মূর্তি। নিখুঁত মূর্তি।

, কেমন করে পাথর হয়ে গেলো? মনে আছে তো,

আগেই বলেছি প্রত্যেক প্রাণীর শরীর খুব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম এক রকম অংশ দিয়ে গড়া, সেই অংশগুলোর নাম হল 'কোষ'। আবার যে মাল-মশলা দিয়ে তৈরি এই কোষ, সেই মালমশলার নাম হল প্রোটোপ্লাজম্। এখন ভেবে দেখো নদীর তলায় থিতিয়ে জমা একটা মাছের শরীরের কথা। ওই ভাবে থিতিয়ে যাবার পর তার শরীরের প্রত্যেকটি কোষের মধ্যে যে প্রোটোপ্লাজম্, তাকে হটিয়ে দিয়ে তার জায়গা দখল করে বসে নানান রকম খনিজ জিনিস। ফলে, কোষগুলোর গড়ন ঠিক থাকে—কেবল ভেতরের মালমশলাটা বদলে যায়। এইভাবে প্রত্যেকটা কোষের ভেতরকার মালমশলা যখন বদলে গেলো তখনও পুরো মাছটার চেহারা মাছের মতোই রইলো, কিন্তু প্রোটোপ্লাস্ম্ দিয়ে গড়া মাছ নয়—পাথরের মাছ। ফসিল। আজো যদি একটা ফসিল থেকে খুব পাৎলা একটা টুকরো কেটে নেওয়া যায় আর অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষা করা যায় ওই টুকরোটাকে, তাহলে তার মধ্যেকার কোষ-গুলোকে স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাবে। এ-কোষ পাথরের তৈরি।

এইবারে ভেবে দেখো পাললিক পাহাড়গুলোর কথা। ওপর ওপর আর থাকে থাকে সাজানো পাথরের স্তর। কোন্ স্তরের বয়েস কতো তা জানতে পারা গিয়েছে। আর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে নানান স্তরে নানান রকম ফসিল। এর থেকেই বুঝতে পারা যায় কোন্ যুগে পৃথিবীর বুকের ওপর কোন্ ধরণের প্রাণীদের বাস ছিলো, বুঝতে পারা যায় যুগের পর যুগ ধরে বদলাতে বদলাতে, বদলাতে বদলাতে, কোন্ কোন্ প্রাণী শেষ পর্যন্ত আজকের পৃথিবীর প্রাণী হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ক্ষুদেদের রাজত্ব
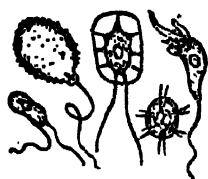
কোন্ প্রাণীর চেহারা সবচেয়ে ক্ষুদে তা বলতে পারো? হাতীর চেয়ে ঘোড়ার চেহারাটা অনেক ছোট, ঘোড়ার চেয়ে ঢের ছোট চেহারা হল কোলাব্যাঙের। আবার কোলাব্যাঙের চেয়ে মশার চেহারা আরো ছোট। কিন্তু অনুবীক্ষণ দিয়ে যদি দেখো তাহলে দেখবে এই মশার শরীরেও অনেক অনেক কোষ। অজস্র কোষ মিলে গড়ে তুলেছে একটা মশা, প্রত্যেকটি কোষই কিন্তু এক একটি জীবন্ত জিনিস, এক একটি প্রাণী।

তাহলে, সবচেয়ে ছোট চেহারার প্রাণীটা কে? যদি কারো পুরো শরীরটা শুধুমাত্র একটা কোষ দিয়ে তৈরি হয় তাহলে নিশ্চয়ই তাকেই বলবো সবচেয়ে ক্ষুদে প্রাণী। আজকের দিনেও এই রকমের প্রাণী দেখতে পাওয়া যায়; কিন্তু আজকের দিনে পুরো পৃথিবী জুড়ে তাদের রাজত্ব নিশ্চয়ই নয়। কেননা, আজকের দিনে পৃথিবীতে অনেক মস্ত মস্ত চেহারার প্রাণীও রয়েছে। বটগাছ, হাতি, ঘোড়া, মানুষ, কতোই না। কোটি কোটি কোষ মিলে তৈরি করেছে এদের সব শরীর, তাই এদের চেহারা এমন বিরাট বিরাট।

পৃথিবীর বয়েস হয়েছে, ধরো, দেড়শো কোটি বছর। খুব সম্ভব তার মধ্যে অর্ধেক সময় পৃথিবীতে কোনো রকম প্রাণীরই চিহ্ন ছিল না। তার মানে, পৃথিবীতে প্রাণী দেখা দিয়েছে পৃথিবীর জন্ম হবার অনেক অনেক পরে। কিন্তু সেই যে প্রথম প্রাণী তাদের চেহারা নেহাৎই ক্ষুদে ক্ষুদে। কেননা, মাত্র একটা করে কোষ দিয়ে তাদের পুরো শরীরটুকু গড়া। অনেক অনেক

অনেক হাজার বছর ধরে পুরো পৃথিবী জুড়ে শুধু এই ক্ষুদে ক্ষুদে প্রাণীদেরই রাজত্ব !

আজকের দিনেও এই রকমের ক্ষুদে ক্ষুদে প্রাণী রয়েছে আর নানান ভাবে দেখতে পাওয়া গিয়েছে তাদের হালচাল। কী রকম হালচাল জানো ?

তাদের না আছে মুখ, না আছে পেট, না হাত-পা-মাথা-মুণ্ড। কিম্বা, তাদের পুরো শরীরটাকেই পা বলতে পারো, পুরো শরীরটাকেই পেট বলতে পারো, মুখও বলতে পারো। কেননা এগিয়ে চলবার যখন দরকার হয়, তখন তারা শরীরের যে-কোনো অংশকে সামনের দিকে একটুখানি যেন ঠেলে দেয় তারপর বাকি শরীরটা যেন গড়িয়ে যায় এই ঠেলে দেওয়া অংশটার মধ্যে। যখন একটা খাবারের দানা জোটে, তখন তারা পুরো শরীরটা দিয়ে এঁকেবেঁকে তালগোল পাকিয়ে যেন জড়িয়ে ধরে খাবারটুকুকে, তারপর খাবারটুকু শুষে নেয় শরীরের মধ্যে। তাই পুরো শরীরটাই মুখ, পুরো শরীরটাই পেট। আবার এই সব প্রাণীদের বাচ্চাও হয়। কিন্তু কী রকম ভাবে জানো ? বাইরের থেকে খাবার দাবার জোগাড় করে শরীরে তো পুষ্টি জোগালো। শরীরটা বেশ বড়সড় হল। মোটাসোটা হল। তারপর হল কি, পুরো শরীরটা আস্তে আস্তে দুভাগে ভাগ হয়ে গেলো। ফলে হয়ে গেলো দুটো আলাদা আলাদা প্রাণী। একটা থেকে জন্ম হল দুটোর। ১৯ পাতার ছবিটা মনে আছে তো ?

অনেক অনেক বছর ধরে পৃথিবীর বুক জুড়ে শুধু এই ধরণের ক্ষুদে ক্ষুদে জীব, যাদের পুরো শরীর বলতে শুধু

একটি করে কোষ। তারপর হল কি,—সে এক ভারি মজার কাণ্ড। এই সব ক্ষুদে ক্ষুদে জীবগুলো যেন দল পাকাতে শুরু করলো, একজোট হতে লাগলো। যতো দিন যায় ততোই দেখা যায় নতুন নতুন ধরণের প্রাণী হচ্ছে, তাদের শরীর আর শুধু একটা কোষ দিয়ে তৈরি নয়, একটার বদলে যেন একদল কোষ। আর যতই দল পাকায় ততই শরীরটাকে চালাবার জন্যে কাজের ভার যেন আলাদা আলাদা হয়ে যায়। তার মানে, যতদিন পর্যন্ত শুধুমাত্র একটা কোষ দিয়ে পুরো শরীরটা গড়া, ততদিন পর্যন্ত পুরো শরীরটা দিয়েই খাওয়া-দাওয়া, চলা-ফেরা, বাচ্চা-পাড়া—সব রকমের কাজ। কিন্তু অনেক অনেক কোষ মিলে যখন দল পাকিয়ে একটা পুরো শরীর গড়লো, তখন নানান রকম কোষের ঘাড়ে নানান রকম কাজের দায় : একদলের ওপর খাওয়াদাওয়ার ভার, এক-দলের ওপর চলাফেরার ভার, একদলের ওপর বাচ্চাপাড়ার ভার, —এই রকম হরেক রকম, আর এই ভাবেই ক্রমশ তৈরি হল সেই ক্ষুদে ক্ষুদে জীব থেকে বড় বড় জীবের শরীর।

ওই সব আদিম ক্ষুদে ক্ষুদে প্রাণীদের কোন ফসিল অবশ্য পাওয়া যায় না। সবচেয়ে পুরনো যে সব ফসিল খুঁজে পাওয়া যায়, সেগুলো হল প্রায় পঞ্চাশ কোটি বছর আগেকার জীবজন্তুর। সবই অনেক বড় বড় জীবজন্তু। তার মানে অনেক অনেক কোষ দিয়ে তৈরি হয়েছে এদের শরীর।

মাছ আর মাছ—খেকো মানুষ

মাছ নইলে তোমার তো চলে না। ভাতের পাতে এক টুকরো মাছ যদি না জোটে তা হলে তোমার মুখেই রুচবে না। কিন্তু কেউ কেউ আছে যারা মাছের নামে ওয়াক তুলবে। যেমন ধরো, গুজরাটীদের কথা। বেশীর ভাগ বাঙ্গালীরই মাছ নইলে চলে না; বেশীর ভাগ গুজরাটীরই মাছের গন্ধে ওয়াক ওঠে।

কিন্তু বাঙ্গালীই বলো আর গুজরাটীই বলো—মাছ না হলে কারুর পক্ষেই আর পৃথিবীর মুখ দেখা হতো না। কেননা, মাছই হোলো মানুষের একেবারে আদিম পূর্বপুরুষ। তার মানে, লক্ষ লক্ষ বছর ধরে একদল মাছ নানান ভাবে বদলাতে বদলাতে শেষ পর্যন্ত মানুষ হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু মাছই বা এলো কোথা থেকে? আর, মাছ বদলে শেষ পর্যন্ত মানুষই বা হোলো কেমন করে?

মানুষের কথা পরে বলবো। তার আগে বলি, মাছ এলো কোথা থেকে।

প্রথমে তো সেই ক্ষুদে ক্ষুদে প্রাণী। পুরো শরীরটাই যাদের শুধু একটা কোষ দিয়ে গড়া। তারপর, অনেক কোষ মিলে দল পাকিয়ে এক একটা প্রাণীর শরীর গড়তে লাগলো। এই ভাবে বদলাতে বদলাতে জলের তলায় দেখা দিলো শ্যাওলা আর সবুজ ছোট ছোট গাছ; শেষ পর্যন্ত এরাই হল আজকের দিনের এতো রকম গাছ-গাছড়ার আদি পুরুষ। ওদের কথা আলাদা। কেননা, গাছ-গাছড়ার কথা আমি বলতে বসি নি।

কিন্তু অনেক কোষ মিলে ক্রমশ গড়ে তুলতে লাগলো আরো নানান রকম প্রাণীর শরীর। হরেক রকম পোকা, কেঁচো, ঝিনুক, গুগ্‌লী, কতোই না। কিন্তু এদের মধ্যে
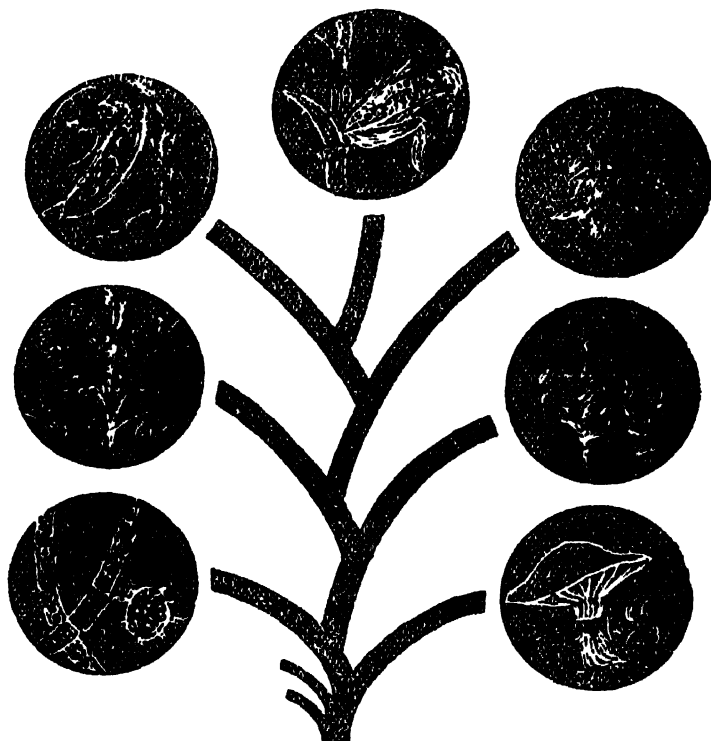
আদিম যুগের ক্ষুদে ক্ষুদে জীব নানান দিকে বদলাতে বদলাতে নানান রকম গাছগাছড়া হয়ে গিয়েছে। জীবজন্তুর বেলাতে যে-রকম গল্প গাছগাছড়ার বেলাতেও সেই রকম গল্পই।

যারা সবচেয়ে সেরা তাদের নাম দেওয়া হয় ট্রাইলোবাইট। ছবিতে দেখো কী রকম তাদের চেহারা। প্রায় বিশ কোটি বছর ধরে জলের মধ্যে শুধু এদেরই রাজত্ব। কেউ বা জলের

তলায় কাদায় আটকে থাকে কেউ বা ভাসে জলের ওপর। জল থেকে সহজেই এরা খাবার জোগাড় করতে পারে। এদের গায়ের ওপর পুরু একটা খোলস, তাই অল্প বিপদে এরা মরে না। তাছাড়া এরা বাচ্চা পাড়ে দেদার—তার মধ্যে অনেক বাচ্চা যদিও মরে যায়, তাহলেও ওদের বংশ ঠিক রক্ষা হয়। আজকের দিনেও এদের কিছু কিছু বংশধর পৃথিবীতে টি'কে রয়েছে, যেমন ধরো কাঁকড়াবিছে আর মাকড়শা। কিন্তু তবুও বলা যায় এই ট্রাইলোবাইটদের গল্প বহুদিন আগেই ফুরিয়ে গিয়েছে। কেননা প্রায় বিশ
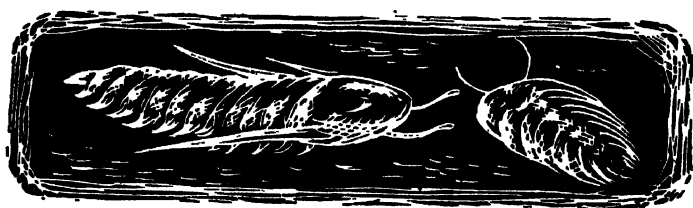
কোটি বছর ধরে জলের মধ্যে প্রায় একচেটিয়া রাজত্ব করবার পর ট্রাইলোবাইটদের বংশ শেষ পর্যন্ত লোপ পেলো।

কিন্তু এই ট্রাইলোবাইটদের বংশ আস্তে আস্তে লোপ পেয়ে গেলেও ইতিমধ্যে পরিষ্কার জলের নীচে এক রকম নতুন ধরণের প্রাণী গড়ে উঠতে লাগলো। তাদের নামটাও ওই ট্রাইলোবাইটদের মতোই বিদ্ঘুটে। কেননা, পণ্ডিতেরা এদের নাম দিয়েছেন অস্ট্রাকোড্রাম। এদের মুখগুলো ছুঁচোলো মতো, কিন্তু মুখের মধ্যে চোয়াল বলে কিছু নেই, তাই চিবিয়ে খেতে এরা জানে না। কাদার মধ্যে ছুঁচোলো মুখ ঢুকিয়ে দিয়ে খাবার শুষে খায়। কিন্তু চোয়াল না থাকুক,

ওদের শরীরে একটা দারুণ দরকারী জিনিস ছিলো। সেই জিনিসটার নাম হল মগজ। মগজ কাকে বলে জানো নিশ্চয়ই। মাথার খুলির মধ্যে নরম মতো একরকম জিনিস থাকে, তাকেই বলে মগজ। শেষ পর্যন্ত এই মগজের দরুণই আমরা কানে শুনতে পাই, চোখে দেখতে পাই—মগজ না থাকলে চোখ থেকেও আমরা অন্ধ হতাম, কান থাকলেও কালা হতাম। শুধু তাই নয়। আমাদের মগজের দরুণই আমাদের এতো বুদ্ধিশুদ্ধি। অবশ্য তোমার আমার—তার মানে মানুষদের—মগজগুলো খুব ভালো আর বেশ বড়। তাই
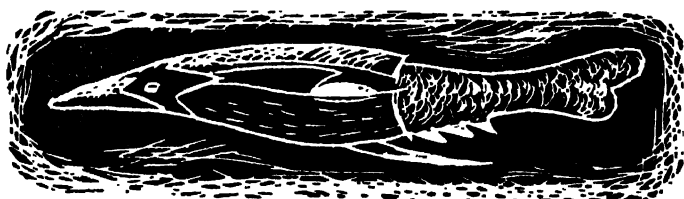
আমাদের বুদ্ধিশুদ্ধি এতো বেশী। সেই প্রাচীনকালের অস্ট্রাকোড্রামদের মগজ দেখা দিলেও, সে-মগজ নেহাৎই সামান্য আর আমাদের তুলনায় তুচ্ছ। তাই, ওদের মাথায় যে বুদ্ধি-শুদ্ধি খুব ছিলো তা মোটেই সত্যি কথা নয়। তবু, মগজ তো দেখা দিলো। আর এই মগজের গুণেই আশপাশের বাকি সব জীবদের তুলনায় এরা হল অনেক উঁচুদরের জীব।

তারপর প্রায় সাড়ে সাত কোটি বছর পরে এদের একদল বংশধর বদলাতে বদলাতে শেষ পর্যন্ত হয়ে গেলো আসল আর খাটি মাছ। মাছদের শরীরে মগজ ছাড়াও অনেক রকম দারুণ দরকারি জিনিস রয়েছে। যেমন ধরো, একটা শিরদাঁড়া

এরকম পরিষ্কার শিরদাঁড়াওয়ালা প্রাণী এর আগে পৃথিবীতে আর দেখা দেয় নি। আজকের দিনে অবশ্য অনেক জানোয়ারের শরীরেই স্পষ্ট শিরদাঁড়া রয়েছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, তারা সবাই শেষ পর্যন্ত ওই মাছদেরই বংশধর। মাছরাই হল পৃথিবীর প্রথম শিরদাঁড়াওয়ালা প্রাণী। শিরদাঁড়া ছাড়াও মাছদের মুখের মধ্যে চোয়াল থাকায় ওরা চিবুতে শিখলো। গায়ে পাখনা থাকায় পাখনা নেড়ে আর লেজ নেড়ে জলের মধ্যে ওরা ঘোরাফেরা করতে শিখলো। কতোই না সুবিধে ওদের! যেন দেখতে দেখতে সমুদ্র ভরে গেলো মাছে মাছে। তারপর প্রায় পাঁচকোটি বছর ধরে জলের বুকে মাছদেরই একচেটিয়া রাজত্ব।

ডাঙার ওঠার পালা

মনে রাখতে হবে, যখন থেকে মাছদের যুগ শুরু হয়েছে তখন থেকেই ডাঙার ওপর দেখা দিয়েছে সবুজের চিহ্ন। তার মানে, লতা-পাতা, ঘাস-গাছ। কিন্তু আজকালকার মতো লতা পাতা গাছপালা নয়। আজকালকার এই সব গাছ-গাছড়ারই পূর্বপুরুষ, কিন্তু সেগুলোর শেকড় টেকড় নেই, মাটির ওপর যেন ভেসে বেড়াচ্ছে! এইগুলোর বংশধররাই বদলাতে বদলাতে শেষ পর্যন্ত আজকালকার গাছপালা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

যাই হোক, মনে রাখতে হবে পুরো মাছদের যুগ ধরে ডাঙার ওপর গাছপালা আর তাদের পূর্বপুরুষ ছাড়া আর

কোনো রকম প্রাণীদেরই চিহ্ন নেই। ডাঙার ওপর জীবজন্তু দেখা দিয়েছে অনেক পরে।

সব প্রথম ডাঙায় যে সব জীবজন্তু দেখা দিলো তারা মাছ-দেরই বংশধর। তাই জল থেকেই তারা উঠে এলো। ডাঙায় উঠে এলো বটে, কিন্তু জলের সঙ্গে সম্পর্ক তারা ছাড়তে

ডাঙায় চলার দিকে

পারলো না। তাই তাদের খানিকটা জীবন জলের মধ্যে, আর খানিকটা জীবন ডাঙার ওপর। পুরোপুরি ডাঙার জীব তাদের বলা চলে না। তাদের বলে উভচর: তার মানে জলেও চলে, স্থলেও চলে। যেমন ধরো, আজকালকার ব্যাঙ-গুলো। ব্যাঙগুলো কি পুরোপুরি ডাঙার জীব? মোটেই নয়। ব্যাঙগুলো কি পুরোপুরি জলের জীব? তাও নয়। তাহলে? দুজায়গারই জীব। তার মানেই উভচর।

উভচররা পুরোপুরি ডাঙার জীব হতে পারলো না কেন? তার কারণ তাদের ডিমগুলো। নরম তুলতুলে তাদের ডিম। ডাঙায় সেই ডিম পাড়লে শুকিয়ে নষ্ট হয়ে যায়। তাই ডিম পাড়বার জন্যে জলের মধ্যে ফিরে না গিয়ে উপায় নেই। যদি পারো তাহলে আজকালকার ব্যাঙের ডিম জোগাড় করো। দেখবে কী রকম নরম জিনিস। জলের মধ্যে না থাকলে ডিমগুলো স্রেফ নষ্ট হয়ে যাবে।

তার মানে, মাছেদের একদল বংশধর বদলাতে বদলাতে উভচর হয়ে গেলো। তারা ডাঙাতেও থাকতে পারে, জলের মধ্যেও থাকতে পারে। কিন্তু কথাটা শুনতে যতো সহজই লাগুক না কেন, ব্যাপারটার মধ্যে এক দারুণ হাঙ্গামা আছে।

হাঙ্গামাটা যে কী রকম তা তুমি নিজের চোখেই দেখতে পারো। জল থেকে একটা জ্যান্ত মাছ তুলে ডাঙায় ছেড়ে দাও, দেখবে খানিকক্ষণের মধ্যেই মাছটা খাবি খেয়ে মরে যাচ্ছে। কেন ওরকম মরে যায়? আমাদের ডাঙায় ছেড়ে দিলে তো আমরা ওরকম মরে যাই না!

তার আসল কারণ হল, আমাদের শরীরের মধ্যে ফুসফুস বলে একটা জিনিস আছে। মাছদের ফুসফুস নেই।

ফুস্‌ফুস্‌ আবার কী? ডাঙার ওপর বাঁচতে গেলে ফুসফুসের দরকার পড়ে কেন?

ডাঙায় চলাফেরা করবার সময় আমরা বুকভরে নিঃশ্বাস নিই। তার মানে, বাইরে থেকে খানিকটা হাওয়া বুকের মধ্যে টেনে নিই। তারপর আমরা নিঃশ্বাস ফেলি। তার মানে, বুকের মধ্যে থেকে হাওয়াটা বার করে দিই। কিন্তু

এর মধ্যে একটা মজা আছে। ঠিক যে হাওয়াটা বাইরে থেকে আমরা ভেতরে টেনে নিলাম সেইটেই আবার বের করে দিই না। তার মধ্যে থেকে খানিকটা জিনিস যেন ছেঁকে নেওয়া হল শরীরের জন্যে, তারপর বাকিটুকু নিঃশ্বাস ফেলে বের করে দেওয়া হল। যে জিনিসটুকু ছেঁকে নিয়ে শরীরের ভেতর রেখে দেওয়া হল তার নাম অক্সিজেন। বাইরের হাওয়ায় অক্সিজেন রয়েছে। অক্সিজেন না হলে শরীর বাঁচে না। কিন্তু কথা হল, শরীরের মধ্যে আমরা কেমন করে হাওয়ার থেকে অক্সিজেনটুকু আলাদা করি? তার কারণ ওই ফুস্‌ফুস্‌। ফুস্‌ফুস্‌ শরীরের মধ্যেকার ভারি আশ্চর্য এক যন্ত্র। এ-যন্ত্র দিয়ে হাওয়ার মধ্যেকার অক্সিজেন ছেঁকে নেওয়া যায়। মাছদের শরীরের মধ্যে এ-রকম যন্ত্র নেই। ডাঙায় তুললে মাছ তাই খাবি খেয়ে মরে যায়।

কিন্তু তাহলে জলের মধ্যে মাছরা বাঁচে কেমন করে? কোথা থেকে পায় অক্সিজেন? জলের মধ্যে থেকে পায় নিশ্চয়ই। কেননা জলের সঙ্গে মিশেল আছে অক্সিজেনের। আর মাছদের শরীরে ফুসফুস না থাকলেও আর একটা যন্ত্র আছে,

সেই যন্ত্র দিয়ে ওরা জলের থেকে অক্সিজেন ছেঁকে নেয়। এই যন্ত্রটার নাম হল কান্‌কো। মাছদের কান্‌কো দেখেছো তো? মাথার ছুপাশে ছুটো কাটা জায়গা, টেনে ফাঁক করে দেখলে দেখবে টুকটুকে লাল। আসলে হয় কি জানো? মাছরা যখন জলের মধ্যে সাঁতরে বেড়াচ্ছে তখন ক্রমাগতই হাঁ করে করে মুখের মধ্যে তারা জল পুরছে। তারপর এই জল বেরিয়ে যাচ্ছে তাদের কানকোর মধ্যে দিয়ে। কিন্তু কায়দা আছে। কান্‌কো ছুটো এমনই মজার যন্ত্র যে তার মধ্যে দিয়ে জল বেরিয়ে যাবার সময় জলের সঙ্গে মেশানো অক্সিজেনটুকু শরীরের জন্যে ছেঁকে রেখে দেওয়া হয়।

তাহলে সমস্যাটা কী রকম দেখো। মাছদের ফুসফুস নেই। ফুসফুস না থাকলে ডাঙায় বাঁচা যায় না। এদিকে মাছদেরই একদল বংশধর হয়ে গেলো উভচর। তারা ডাঙায় বাঁচতে পারে। কেমন করে হল?

আসলে মাছদের যুগে যে-সব মাছদের বাস, মোটের ওপর তারা ছুরকমের। এক রকম হল, হাঙর ধরণের মাছ। তাদের কঙ্কাল ঠিক হাড়ের তৈরি নয়; তরুণাস্থি বলে একরকম নরম হাড় ধরণের জিনিস দিয়ে তৈরি। আর অন্য ধরণের যে মাছ তাদের কঙ্কালগুলো হাড় দিয়েই তৈরি।

এখন, এককালে হয়েছিলো কি জানো? এই যেসব হাড়ের কঙ্কাল-ওয়ালা মাছ এদের শরীরের মধ্যে সত্যিই ফুস্‌ফুস্‌ গজিয়েছিলো। তখন যদি তাদের শরীরের মধ্যে ফুস্‌ফুস্‌ না গজাতো তাহলে তাদের পক্ষে বাঁচাই সম্ভব হতো না। কেননা, তখনকার দিনে পৃথিবীর আবহাওয়াটাই ছিলো অন্য

রকমের। যখন বৃষ্টি তখন দারুণ বৃষ্টি। কিন্তু যখন অনাবৃষ্টি তখন এমন দারুণ অনাবৃষ্টি যে সবকিছু শুকিয়ে খাক হয়ে যাবার জোগাড়। অনাবৃষ্টির সময় জল শুকিয়ে পালে পালে প্রাণী মরতে শুরু করে, জলের মধ্যে পচতে থাকে তাদের শরীর আর তাই ওই জলের মধ্যে থেকে অক্সিজেন জোগাড় করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। তখন বাঁচবার একমাত্র উপায় হল জলের ওপর মুখ তুলে ওপরের হাওয়া থেকে অক্সিজেন জোগাড় করা। আর অনেক অনেক অনেক দিন ধরে এই চেষ্টা চালাতে চালাতে শেষ পর্যন্ত সত্যিই ওই হাড়ওয়ালা মাছদের শরীরে গড়ে উঠলো ফুস্‌ফুস্‌। দেখা দিলো, ফুস্‌ফুস্‌-ওয়ালা মাছ। আজকাল অবশ্য এরকম মাছ বড় একটা দেখতে পাওয়া যায় না। কেননা, পৃথিবীর আবহাওয়া আবার বদলালো। দেখা গেলো পরিষ্কার জলের জায়গা অনেক রয়েছে, তার সঙ্গে দেদার অক্সিজেন মেশানো। তাই সেখানকার সব মাছদের পক্ষে আর ফুস্‌ফুসের দরকার রইলো না। কান্‌কো দিয়েই কাজ চলে। কিন্তু তখন তাদের ফুস্‌ফুস্‌-গুলোর কী হল? সেগুলো বদলাতে বদলাতে একরকম হাওয়ার থালে হয়ে গেলো। কাটা মাছের ভেতরটা দেখেছো তো? দেখেছো তো, তার মধ্যে একরকম সাদা ছোট্ট বেলুনের মতো জিনিস আছে? এই জিনিসগুলোকে বলে 'পট্‌কা', এই পট্‌কাই হল ফুস্‌ফুস্‌ বদলে যাওয়া হাওয়ার থলে।

সে যাই হোক, এখন উভচরদের রহস্যটা বুঝতে পারছো তো? যে-সব হাড়ওয়ালা মাছদের শরীরে এককালে ফুস্‌ফুস্‌ গজিয়েছিলো তাদেরই বংশধর হল ওই উভচরের দল। তাই

উভচরদের শরীরেও ফুসফুস আর তাই উভচররা ডাঙায় বাঁচতে পারে, পারে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিতে।

দুঃস্বপ্নের যুগ

তারপর শেষ এল ওই উভচরদের যুগ। সে আজ প্রায় বিশ কোটি বছর আগেকার কথা। খাঁটি উভচর বলতে আজকাল ব্যাঙ-ট্যাঙ ধরণের শুধু দুএকরকম প্রাণী চোখে পড়ে। বেশীর ভাগই গিয়েছে মরে। তবে, উভচরদের একরকম বংশধর আজো আমরা দেদার দেখতে পাই। এই বংশধরদের নাম দেওয়া হয় সরীসৃপ। সরীসৃপ কাদের বলে জানো? যারা বুকের ওপর ভর দিয়ে চলে তাদের বলে সরীসৃপ। যেমন ধরো, আজকের দিনের সাপ, কিম্বা টিকটিকি। কারুর বা পা নেই, কারুর বা পা আছে। কিন্তু ওদের বেলায় এইটাই বড় কথা নয়। বড় কথা হল, বুকের ওপর ভর দিয়ে হাঁটবার কথা।

তার মানে, উভচরের একদল বংশধর বদলাতে বদলাতে, বদলাতে বদলাতে, শেষ পর্যন্ত সরীসৃপ হয়ে গেলো। সরীসৃপরা কিন্তু পুরোপুরি ডাঙার জীব, উভচরদের মতো এক-পা জলে নয়। তার মানে, উভচররা যা পারে নি সরীসৃপরা তা পারলো—পারলো জলের মায়া একেবারে কাটিয়ে আসতে। কিন্তু কথা হচ্ছে, কেমন করে পারলো? তার আসল কারণ হল সরীসৃপদের ডিমগুলো। এদের ডিমের ওপর শক্ত খোলস, উভচরদের মতো তুলতুলে নরম ডিম নয়। আর

তাই ডিম পাড়বার জন্যে জলে ফিরে যেতে হয় না। ডাঙার ওপরেই ডিম পাড়তে পারে, ডিমের ওপর তা দিতে পারে।

সরীসৃপদের শরীরে এ-ছাড়াও আরো কয়েক রকম সুবিধে। ঘোরাফেরা করবার ব্যাপারে, নিঃশ্বাস নেবার ব্যাপারে, নানান ব্যাপারে সুবিধে। তাই দেখতে দেখতে পৃথিবীর বুক অনেক অজস্র রকম সরীসৃপে ভরে যেতে লাগলো। তার মানে, উভয়চরদের বংশধররা নানান ভাবে বদলাতে বদলাতে নানান রকমের সরীসৃপ হয়ে দাঁড়াতে লাগলো। কারুর বা পাগুলো খুব মজবুত, দিব্যি হেঁটে বেড়াতে পারে। কারুর বা শরীর থেকে পায়ের চিহ্ন বেবাক মুছে গেলো। যেমন ধরো সাপ। কারুর বা পাগুলো বদলাতে বদলাতে নৌকার দাঁড়ের মতো হয়ে গেলো। তারা ফিরে গেল জলের ভেতর। আবার কারুর শরীরে গজালো চামড়ার ডানা। আজকালকার বাদুড় দেখেছো ত? তাদের যে-রকম ডানা আছে অনেকটা সেই রকম। এই সব সরীসৃপেরা চামড়ার ডানা দিয়ে আকাশে উড়তে শুরু করলো। অবশ্য তাই বলে এই উড়ো-সরীসৃপরাই আজকালকার পাখীর পূর্বপুরুষ নয়। আজকালকার পাখী সরীসৃপদেরই বংশধর, কিন্তু অন্য এক রকম সরীসৃপদের,—ওই চামড়ার ডানাওয়ালা উড়ো সরীসৃপদের নয়।

এতো রকম সরীসৃপদের মধ্যে সবচেয়ে জমকালো গল্প যাদের নিয়ে তাদের নাম দেওয়া হয় ডাইনোসার। এমন সব অতিকায় জানোয়ার পৃথিবীর বুকে আর কখনো জন্মায় নি। আজকালকার হাতিগুলোও তাদের পাশে ছেলেমানুষ যেন। ছবিতে দেখো, কী রকম মূর্তিমান দুঃস্বপ্নের মতো এক একটি

চেহারা! অনেকদিন ধরে চললো এই ডাইনোসারদের যুগ, এক দুঃস্বপ্নের যুগ যেন! দুচার রকম ডাইনোসারের নমুনা দিই। এক রকম ডাইনোসারের নাম হল ডিপ্লোডোকাস। লম্বায় ৫৮ হাত। কিন্তু নিরামিষ খায়। বুদ্ধিটাও নেহাত মাটো ধরণের। কেননা এমন বিরাট চেহারা হলেও মাথার মগজটা ছোট্ট, একটা মুরগীর ডিমের মতো। মানুষের সঙ্গে তুলনা করো, তাহলেই বুঝতে পারবে মগজটা কতটুকু। মানুষের শরীর মাত্র সাড়ে তিন হাত লম্বা, কিন্তু মগজের ওজন দেড় সের। তার মানে গোটা

কয়েক রকম ডাইনোসারের চেহারা

তিরিশ ডিপ্‌লোডোকাসের মগজ এক করলে একটি মানুষের মগজের সমান ওজন হবে। কিন্তু তাই বলে বুদ্ধিতে মোটেই সমান হবে না। তারা যে বোকা সেই বোকাই থাকবে। আর একরকম ডাইনোসারের নাম হল ব্রাসিওসরাস। তাদের ওজন কতো জানো? চারশো পঞ্চাশ মণ। গলাটা এতো লম্বা যে মাটিতে দাঁড়িয়ে আজকালকার যে কোন দোতলা বাড়ির ছাদটা উঁকি মেরে দেখে নিতে পারতো!

আর একরকম ডাইনোসার—এর নাম হল টিরেনোসরাস। এ যেন স্বয়ং যমদূত। লম্বায় উনিশ ফুট, সামনের পা দুটো ছোট ছোট, পেছনের পা দুটো থামের মতো। দাঁতগুলো মূলোর মতো, এতোখানি হাঁ, ল্যাজের ঝাপটায় জঙ্গল কাঁপে। এতো বিরাট মাংসখেকো জানোয়ার পৃথিবীতে আর কখনো জন্মায় নি। তাই টিরেনোসরাস যখন শিকারে বেরোতো তখন অন্যসব অতিবড় ডাইনোসারও ভয়ে একেবারে থরহরি কম্পমান।

এই রকম অনেক রকমের ডাইনোসার। অনেক লক্ষ বছর ধরে পৃথিবীর ওপর এদেরই দুর্দান্ত দাপট।

কিন্তু অমন বিরাট বিরাট দৈত্যের মতো চেহারা হলে কি হয়, শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর বুকে ওরাও আর টি কতে পারলো না। শুধু পড়ে রইলো ওদের কঙ্কালগুলোর কিছু কিছু ফসিল।

কিন্তু কেন? কেন ওরা টি ঁকতে পারলো না?

সে আজ প্রায় ছ'কোটি বছর আগেকার কথা। পৃথিবীর বুকের ওপর শুরু হল এক রসাতল-তলাতল কাণ্ড। মস্ত মস্ত জলাভূমিগুলো শুকিয়ে গিয়ে খাঁ খাঁ করতে লাগলো,

মাথা তুলে দাঁড়াতে আরম্ভ করলো বিরাট বিরাট পাহাড়ের চূড়ো! উত্তর শিয়র থেকে বইতে শুরু করলো শুকনো আর ঠাণ্ডা হাওয়া। সেই হাওয়ায় শুকিয়ে মরে যেতে লাগলো গরম জায়গার গাছপালাগুলো।

পৃথিবীর চেহারাটাই গেলো বদলে। এর আগে পর্যন্ত যে-রকম অবস্থা ছিলো ডাইনোসারদের পক্ষে সেইটেই খাসা। কেননা, এই সব বিভীষিকার মতো বড়বড় জানোয়ারদের
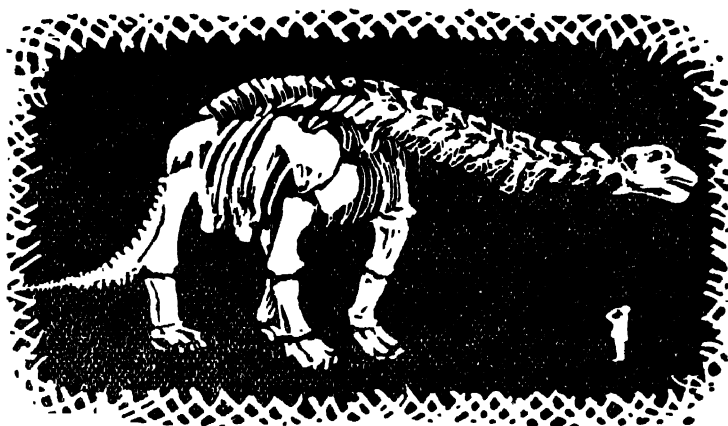
যাদুঘরে রাখা এক অতিকায় ডাইনোসারের কঙ্কাল।

অনেকেই থাকতো জলার মধ্যে গা-ডুবিয়ে, খেতো জলা জায়গার গাছপালা, বাঁচতো ভিজে আর গরম হাওয়ায়। পৃথিবীর চেহারা বদলে গিয়ে নতুন যে চেহারা হল তার মধ্যে এরা বাঁচবে কেমন করে? নতুন অবস্থার সঙ্গে ওরা নিজেদের খাপ খাওয়াতে আর পারলো না।

আর তাই শেষ হল ওই দুঃস্বপ্নের দিন, শেষ হল সরীসৃপদের যুগ। তারপর?

ডিম নয় আর

এদিকে, ইতিমধ্যেই পৃথিবীর বুকে আর এক রকম জানোয়ার দেখা দিয়েছে। ইঁদুরের মতো ছোট্ট তাদের চেহারা। তার মানে, ডাইনোসারদের তুলনায় একেবারে কিছু নয়। তবুও, ওই বিরাট বিরাট জানোয়ারদের সঙ্গে এক রকম জ্ঞাতি সম্পর্ক। কেননা, সরীসৃপদেরই এক আদিম বংশধরের দল নানান ভাবে বদলাতে বদলাতে শেষ পর্যন্ত এই নতুন ধরণের জানোয়ার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই যে নতুন ধরণের জানোয়ার এদের নাম স্তন্যপায়ী।

এদের শরীরে অনেক রকম নতুন সুবিধে। এদের গা গুলো লোমে ঢাকা আর তাছাড়া এদের রক্তকে বলে গরম-রক্ত। গরম-রক্ত কাকে বলে জানো? আসলে জন্তু জানোয়ারদের রক্ত দুরকমের। এক রকম জানোয়ার আছে যাদের রক্ত সব সময় সমান গরম থাকে। তার মানে, বাইরের আবহাওয়াটা গরমই হোক আর ঠাণ্ডাই হোক তাতে বিশেষ কিছু এসে যায় না, শরীরের ভেতরকার রক্তটা সমান গরমই থাকে। কিন্তু আর একরকম জানোয়ারদের বেলায় অন্য রকম। আবহাওয়ার সঙ্গে তাদের রক্তের তাপ ওঠানামা করে। তার মানে, আবহাওয়াটা খুব ঠাণ্ডা হলে তাদের রক্তও খুব ঠাণ্ডা হয়ে যায়; আবহাওয়াটা বেশ গরম থাকলে তবেই শরীরে রক্তটা গরম থাকে। এদের বলে ঠাণ্ডা-রক্তওয়ালা জানোয়ার।

পৃথিবীর বুকে বাঁচতে গেলে ঠাণ্ডা-রক্তের চেয়ে গরম-রক্ত

ঢের বেশী সুবিধের। শীতের সময় রক্ত যদি হিম হয়ে যায় তাহলে তো মহা বিপদ! পৃথিবীর আবহাওয়া তো সমান নয়। কোথাও খুব ঠাণ্ডা, কোথাও বা খুব গরম। কখনো খুব ঠাণ্ডা, কখনো বা খুব গরম।

স্তন্যপায়ীদের আগে পর্যন্ত পৃথিবীতে যতো রকমের জানোয়ার তাদের সবাইকার রক্তই ঠাণ্ডা-রক্ত। এমন কি ওই বিরাট বিরাট ডাইনোসারদেরও তাই। আর তাই, প্রায় ছ'কোটি বছর আগে পৃথিবীর বুকে যখন ওই রকম রসাতল কাণ্ড শুরু হল, স্যাঁৎসেঁতে আর গরম হাওয়ার বদলে বইতে শুরু করলো হিম শুকনো হাওয়া,—তখন স্তন্য-পায়ীর দল বেঁচে গেলো। তাদের গায়ের ওপরটা লোমে ঢাকা, তাদের গায়ের ভেতরটায় গরম-রক্ত।

অবশ্য এছাড়াও স্তন্যপায়ীদের আরো নানান সুবিধে ছিলো। ওদের মাথার মধ্যেকার মগজগুলো অনেক ভালো, তাই ওরা অনেক বেশী হুঁশিয়ার আর অনেক বেশী সজাগ। ওদের দাঁতগুলো, ওদের পাগুলো অনেক ভালো, শরীরের মধ্যে নিঃশ্বাস নেবার ব্যবস্থাটাও অনেক ভালো।

আর তাছাড়াও আরো একটা সুবিধে। মস্ত বড় সুবিধে সেইটে। স্তন্যপায়ীদের বেলায় শেষ হল ডিম পাড়বার পালা। ডিম পাড়বার বদলে একেবারে তৈরি বাচ্চা পাড়বার ব্যবস্থা।

সরীসৃপরা পর্যন্ত সমস্ত জীবজন্তুই ডিম পাড়তো। সেই ডিম ফুটে বাচ্চা বেরুতো। কিন্তু ডিম পাড়বার নানান হাঙ্গামা। ডিমগুলো একটু আধটুতেই নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাই ডিম পাড়বার জন্যে সুবিধেমতো জায়গা পাওয়া চাই।

তারপর ডিম পাড়বার পরই তো আর হাঙ্গামা চোকে না। ডিমগুলো দেখাশুনো করা, নিয়ম করে তা দেওয়া, তা দিয়ে দিয়ে বাচ্চা ফোটানো।

এতো সবের বদলে, যদি একেবারে তৈরি বাচ্চা পাড়া যায় তাহলে কতো সুবিধে ভেবে দেখো। তাছাড়াও কিন্তু আরো ব্যাপার আছে! ডিম না হয় পাড়া গেলো, ডিমের ওপর তা দিয়ে না হয় বাচ্চাও ফোটানো গেলো। কিন্তু তারপর? বাচ্চাগুলোকে খাওয়াতে হবে তো! তার মানে, বাচ্চা ফোটাবার পর বাচ্চাদের জন্যে আবার খাবার জোগাড় করো রে! কিন্তু স্তন্যপায়ীদের বেলায় এ-হাঙ্গামা নেই। কেননা স্তন্যপায়ীদের মা-য়ের শরীরের মধ্যেই বাচ্চাদের জন্যে দুধ তৈরি হবার ব্যবস্থা। সেই দুধ খেয়েই বাচ্চারা বড়ো হবে। আসলে, স্তন্যপায়ী নামটার মানেই তাই। মা-র বুক থেকে দুধ খেয়ে বড় হয়, তাই ওই নাম।

অবশ্য, শুরুর দিকে স্তন্যপায়ীদের চেহারা নেহাৎই তুচ্ছ। কিন্তু ওদের শরীরে এতো রকম সুবিধে বলেই দেখতে দেখতে পৃথিবী জুড়ে ওদের দাপট শুরু হল। সরীসৃপদের যুগের পর স্তন্যপায়ীদের যুগ শুরু।

সবপ্রথম যে-সব স্তন্যপায়ীরা দেখা দিলো তাদের বংশধররা নানান দিকে নানান ভাবে বদলাতে বদলাতে শেষ পর্যন্ত হরেক রকম জানোয়ার হয়ে গেলো। আকাশে বাদুড়, ডাঙায় সিংহ, হাতি, জেব্‌রা, জিরাফ, জলের তলায় মাছ খেকো মাছ! শুধু তাই নয়। স্তন্যপায়ীদের একদল বংশধর গাছের ডালে বাসা বাঁধলো।

স্তন্যপায়ীদের এই বংশধরগুলির নাম দেওয়া হয় প্রাইমেট। প্রাইমেটদের আবার নানান রকম বংশধর। একদিকে হরেক রকমের বাঁদর আর একদিকে হরেক রকমের বনমানুষ। এই বনমানুষদের আবার হরেক রকম বংশধর। কারুর নাম ওরাঙ ওটাঙ, কারুর নাম সিম্পাঞ্জি, কারুর নাম গরিলা। আবার কারুর নাম শুধু মানুষ। তার মানে আমরা।

সেই সব প্রাইমেট,—যাদের একদল বংশধরের নাম হল বনমানুষ,—আজকের পৃথিবীতে তাদের আর খুঁজে পাওয়া যায় না। এমন কি, ওই সব বনমানুষ,—যাদের একদল বংশধরের নাম হয়েছে শুধু মানুষ,—আজকের দিনে তাদেরও আর দেখা নাই।

কিন্তু কথা হল, বনমানুষের একদল বংশধর বদলাতে বদলাতে, বদলাতে বদলাতে, শেষ পর্যন্ত কেমন করে মানুষ হয়ে গেলো?

মনে রাখতে হবে, এই সব বনমানুষদের আড্ডা ছিলো গাছের ওপর। তাদের গায়ে লোম, মুখে লোম, পেছনে লেজ। আর তাদের ছিলো চারটে করে পা।

কিন্তু গাছে গাছে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে এই চারটে পায়ের মধ্যে খানিকটা তফাৎ দেখা দিলো। কেননা, গাছে থাকতে গেলে সামনের পা-জোড়া কাজে লাগে অনেক বেশী। গাছের ডাল আঁকড়ে ধরা থেকে শুরু করে ফলমূল যোগাড়

করা, ফলমূল মুখে পোরা, সব কিছু ব্যাপারেই পেছনের পায়ের চেয়ে সামনের পা-জোড়ার কাজ অনেক বেশী। আর তাই এইভাবে কাজে লাগতে লাগতে, কাজে লাগাতে লাগাতে, সামনের পা-জোড়া বদলে যেতে থাকে।

তারপর হল এক ভারি অবাক কাণ্ড। এমনতরো অবাক কাণ্ড দুনিয়ায় খুব কমই ঘটেছে। ওই চারপেয়ে বনমানুষ-দের মধ্যে একদল বনমানুষ গাছের বাসা ছেড়ে নেমে এলো সমান জমির ওপর। আর তারপর তারা শিখলো সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াতে। চার পা ছেড়ে দুপায়ের ওপর ভর দিয়ে।

সে অনেক বছর আগেকার কথা। নিদেন পক্ষে লাখ দশেক বছর তো হবেই। তখনকার পৃথিবীর চেহারাটাই ছিলো অন্য রকমের। আজকালকার দিনে পৃথিবীর যে ছবি তাতে দেখবে অনেকখানি জায়গা জুড়ে রয়েছে ভারত মহাসাগর বলে বিরাট সমুদ্র। তখনকার দিনে ওইখানে কিন্তু ওই রকম বিরাট সমুদ্র ছিলো না। তার বদলে ছিলো এক মহাদেশ। সে-দেশ হারিয়ে গিয়েছে আজকের ওই মহাসমুদ্রটার নীচে।

অতোদিন আগে ওই হারিয়ে যাওয়া মহাদেশটার বুক থেকে অনেকখানি জায়গা জুড়ে মুছে গেলো বনজঙ্গলের চিহ্ন। হয়ত দাবানলে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিলো সেই বন, হয়ত বা ভূমিকম্পের চোটে ধ্বসে নেমে গিয়েছিলো মাটির নীচে। কিম্বা হয়ত, উত্তর দিক থেকে নেমে আসছিলো ওই বনজঙ্গল। ঠিক যে কেন তা বলা কঠিন। কিন্তু মোটের ওপর ব্যাপারটা হল ওইই। পৃথিবীর বুক থেকে মুছে গেলো অনেক

খানি জায়গাজোড়া বনজঙ্গল। আর তাই গাছের বাসা ছেড়ে নেমে আসতে হল সেই পুরোনো বনমানুষের দলকে।

গাছে গাছে বাঁচতে গেলে চারটে করে পায়ের দরকার পড়ে বই কি। কিন্তু মাটির বুকে চলবার সময় দুটো পাই তো যথেষ্ট। আর তাই, মাটির ওপর নেমে আসবার পর সেই বনমানুষের দল সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াতে শিখলো।

চার পা ছেড়ে দুপা। কিন্তু আগেকার সেই ফালতু দুটো পা? সেই পা দুটোর কী হল? বনমানুষের দশায় থাকতে থাকতেই সে পা দুটো বদলাতে শুরু করেছিলো। সামনের পা জোড়া আর পেছনের পা জোড়ায় অনেক তফাৎ। তারপর সমান মাটির ওপর সোজা হয়ে দাঁড়াতে শেখবার পর সামনের পা-জোড়া আরো আরো বদলাতে লাগলো। বদ-লাতে বদলাতে, বদলাতে বদলাতে, অনেক অনেক বছর পরে, অনেক অনেক বংশ পেরিয়ে, বনমানুষদের ওই ফালতু পা দুটো শেষ পর্যন্ত মানুষের হাত হয়ে গেলো। বনমানুষরা আর বনমানুষ রইলো না, মানুষ হয়ে গেলো।

আমরা যে মানুষ হয়েছি তা আসলে আমাদের এই হাতের গুণেই। আর কোন জানোয়ারের এ-রকম হাত নেই যে-রকম আছে আমাদের। সিম্পাঞ্জীর থাবা বা গরিলার থাবা কিন্তু হাত নয়। তাই দিয়ে বড়জোর একটা কিছুকে আঁকড়ে ধরা যায়। কিন্তু তাই দিয়ে হাতিয়ার বানানো যায় না। একমাত্র মানুষই হাত দিয়ে হাতিয়ার বানাতে পারে। আর কেউ তা পারে না। হাতের গুণেই হাতিয়ার। আবার হাতিয়ারের গুণেই হাত। আর এই হাত

আর হাতিয়ারের গুণেই মানুষ হয়েছে মানুষ। পশু নয় আর।

হাতিয়ার কাকে বলে? যা হাতে নিয়ে আমরা পৃথিবীর সঙ্গে লড়াই করি তাকে বলে হাতিয়ার। যেমন আমাদের কাস্তে কুড়ুল, তীর ধনুক, কোদাল হাতুড়ি সব কিছুই।

ওপরে মানুষের হাত, নীচে মানুষের পা। হাতে-পায়ে কত তফাৎ দেখো!

ওপরে গরিলার হাত আর তলায় গরিলার পা। মানুষের তুলনায় কতো স্থূল দেখো!

কিন্তু পৃথিবীর সঙ্গে লড়াই করা মানে? আসলে, ওইখানেই তো বাকি সব জানোয়ারের সঙ্গে মানুষের মস্ত তফাৎ। বাকি সবাই বেঁচে থাকে পৃথিবীর মুখ চেয়ে, পৃথিবীর

দয়ার ওপর নির্ভর করে। কপালে যদি খাবার জোটে তাহলেই তাদের পেট ভরবে, নইলে নয়। কপালে যদি মাথা গোঁজবার জায়গা জোটে তাহলেই মাথা গুঁজতে পারবে, নইলে নয়। মানুষ কিন্তু এ-রকম অসহায়ের মতো, এ-রকম নিরুপায়ের মতো বেঁচে থাকতে রাজি নয়। মানুষ শিখেছে পৃথিবীর কাছ থেকে নিজের দরকার মতো জিনিস জোর করে আদায় করে নিতে। তাই মাটির বুক চিরে ফসল আদায় করা, মাটি পুড়িয়ে আর পাথর কেটে বাড়ি গাঁথতে শেখা। আকাশকে জয় করবার জন্যে মানুষ উড়োজাহাজ বানিয়েছে, পাতালকে জয় করবার জন্যে পরেছে ডুবুরীর পোষাক। আর মানুষ যে পৃথিবীকে এমন করে জয় করতে শিখেছে তার আসল কারণ হল মানুষের ওই হাতিয়ার।

কিন্তু বুদ্ধি? তুমি হয়ত তর্ক তুলে বলবে, মানুষের এতোযে কীর্তি তার আসল কারণ হল মানুষের ওই বুদ্ধিই। আর কোনো জানোয়ারের তো মানুষের মতো বুদ্ধি নেই! নিশ্চয়ই নেই। কিন্তু কেন? শেষ পর্যন্ত কিন্তু তার কারণ মানুষের ওই হাত, ওই হাতিয়ার। কেননা, বুদ্ধি বলে ব্যাপারটা নির্ভর করে মাথার খুলির মধ্যে মগজ বলে যে জিনিস আছে সেই জিনিসটার ওপর। মানুষের মগজটা অনেক বড়, মানুষের মগজের গড়নটা অনেক ভালো, আর তাই জন্যেই তো এতো বুদ্ধি। কিন্তু মগজটা এতো ভালো হল কী করে? সিম্পাঞ্জীর মগজ আর ওরাঙওটাঙের মগজ তো এতো ভালো হয় নি! তার কারণ, ওই হাত, মানুষের হাত। আসলে শরীরের নিয়-মই এই যে তার মধ্যে কোনো একটা অঙ্গ বাকি অঙ্গগুলোকে

বাদ দিয়ে, শুধু নিজে নিজে, আলাদা ভাবে, বদলাতে পারে না। একটা অঙ্গ বদল হবার সঙ্গে সঙ্গে অন্য অঙ্গগুলোও বদলাতে থাকে। তাই বনমানুষদের সেই ফালতু পা দুটো বদলাতে বদলাতে, বদলাতে বদলাতে, যতোই মানুষের হাত হয়ে যেতে
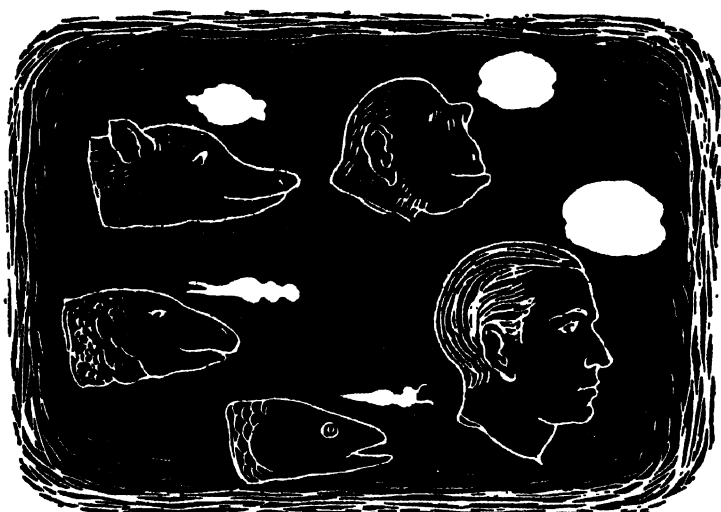
পাঁচ-রকম প্রাণীর মগজের ছবি। মানুষের মগজটা কতো বড় দেখো!

লাগলো ততোই অন্য রকম হয়ে যেতে লাগলো বাকি সব অঙ্গগুলোর সঙ্গে মাথার খুলির মধ্যে মগজ বলে জিনিসটাও। আর তাই শেষ পর্যন্ত মানুষের চেহারা মানুষের মত হল, মানুষের মাথায় এতো বুদ্ধি দেখা দিলো।

পরে বলবো

"ঘুম পাচ্ছে?" এতোক্ষণ পরে আমি রুণুকে জিজ্ঞেস করলাম।

"উঁহুঁ," রুণু বললো, "বেশ মজার লাগছে। ছিলো ক্ষুদে ক্ষুদে জীব, হয়ে গেল মাছ। ছিলো মাছ, হয়ে গেলো উভচর। ছিলো উভচর, হয়ে গেলো সরীসৃপ। ছিলো সরীসৃপ, হয়ে গেলো স্তন্যপায়ী। আবার, ছিলো বনমানুষ, হয়ে গেল মানুষ! এর চেয়ে মজা কি আর কিছু হতে পারে?"

"উঁহুঁ। এর চেয়ে ঢের মজার ব্যাপার আছে। আমার গল্প এই তো সবে শুরু হয়েছে।"

"বেশ তো। তাহলে সেই বেশী বেশী মজার মজার ব্যাপারগুলো বলো।"

"কিন্তু আমার মনে হচ্ছে তোমার ঘুম পাচ্ছে।"

"উঁহুঁ। আমার বেশ মজার লাগছে।"

"তাহলে বোধ হয় আমারই ঘুম পাচ্ছে।

"তাহলে?"

"তাহলে এখন আমি একটু গড়িয়ে নিই। পরে আবার গল্পটা চালাবো।"

"বেশ, তা নাও। কিন্তু পরে ঠিক বলবে তো?"

"নিশ্চয়ই বলবো।" আমি বললাম।